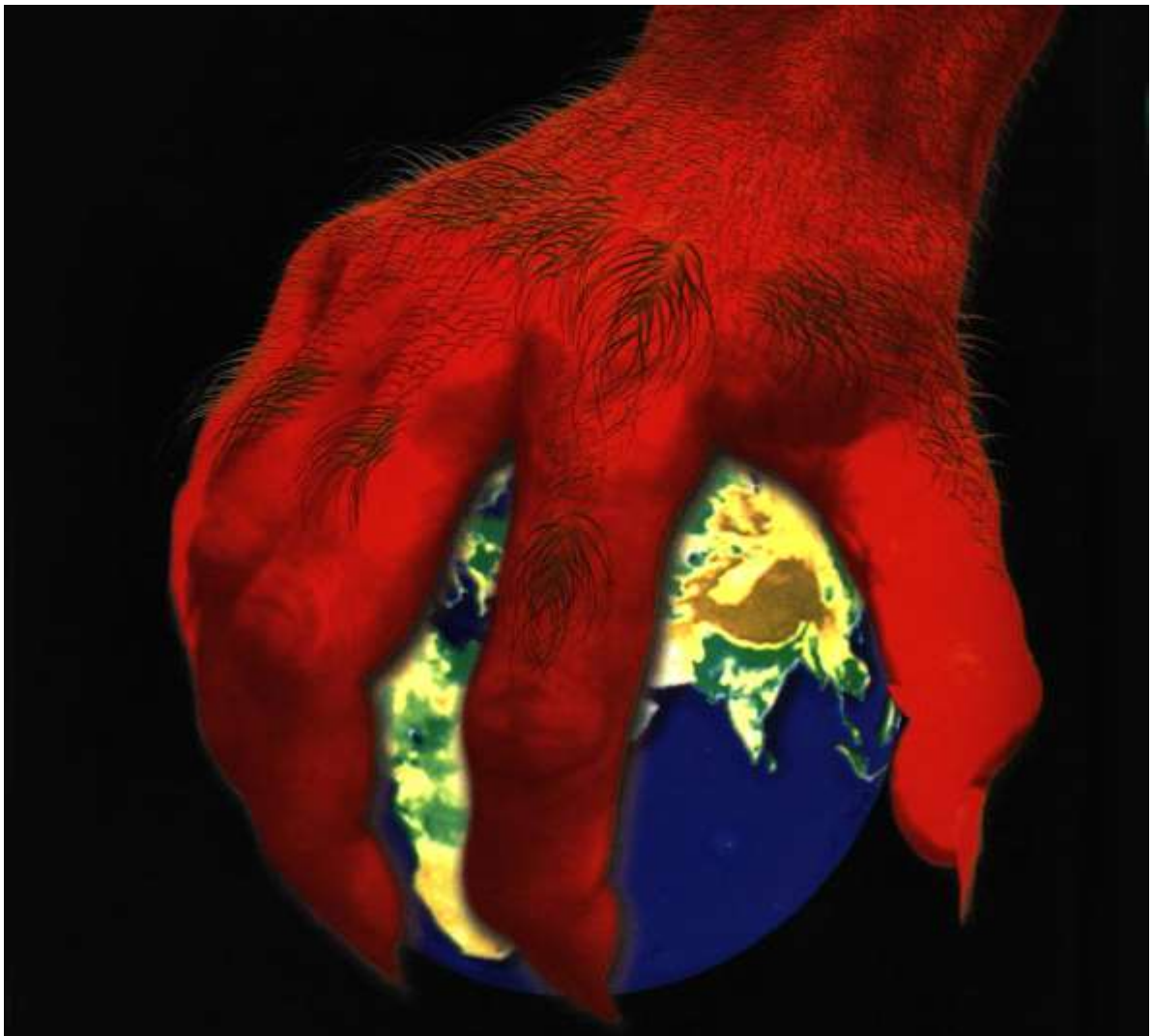

দাজ্জাল?

ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

দাজ্জাল ?

ইহুদী- খৃষ্টান ‘সভ্যতা’!

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
তওহীদ প্রকাশন

২০০৮ এর সর্বোচ্চ সংখ্যক বিক্রয়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী বই

দাজ্জাল ? ইহুদী- খৃষ্টান ‘সভ্যতা’!
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৬৭০- ১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০- ১৭৪৬৫১

I SBN- 978- 984- 33- 1559- 5
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০১ (সংশোধিত)
তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩
চতুর্থ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৬
পঞ্চম প্রকাশ : জুন ২০০৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)
ষষ্ঠ প্রকাশ : আগস্ট ২০০৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)
সপ্তম প্রকাশ (১ম মুদ্রণ) : ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ (পরিবর্ধিত)
সপ্তম প্রকাশ (২য় মুদ্রণ) : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮
সপ্তম প্রকাশ (৩য় মুদ্রণ) : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮
অষ্টম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৮ (সংশোধিত)
নবম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৯ (সংশোধিত)
দশম প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারী ২০১০ (সংশোধিত)
একাদশতম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১০
দ্বাদশ প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল ২০১
ত্রয়োদশ প্রকাশ : ২২ জুন ২০১০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : উম্মুত্ তিজান মাখ্দুমা পন্নী
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : কাজী আব্দালাহ আল মাহফুজ
মূল্য: ৮০.০০ টাকা মাত্র (U. S $- ৭.০০)

উন্মুক্ত

এই বইয়ের কোন স্বত্ব নেই। যে কেউ এই বই মুদ্রণ ও প্রকাশ কোরতে পারবেন। শুধু দুইটি শর্ত্ত - (ক) ঐ মুদ্রণ এই বইয়ের নির্ভুল (Exact) নকল হোতে হবে, কোথাও সামান্য ভুলও থাকতে পারবে না, অন্ততঃ বক্তব্যের অর্থ বা উদ্দেশ্য বদলে যায় এমন ভুল থাকতে পারবে না। (খ) যদি কেউ কোন বিষয় (Point, Subject) আরও ভালো কোরে প্রকাশ কোরতে চান, বা বইয়ের বক্তব্যের সমর্থনে আরও সুন্দর যুক্তি, প্রমাণ বা তথ্য যোগ কোরতে চান- এক কথায় এই বইকে আরও সুন্দর, আরও যুক্তিবহ কোরতে চান, তবে এই বইয়ের কোন্ কোন্ লাইনে কি পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন কোরতে চান তা উল্লেখ কোরে এই বইয়ের প্রকাশকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া ভাষান্তর (Translation) কোরলেও তা প্রকাশককে দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

ঢাকা বিনীত

১৫ অক্টোবর, ২০০৯ ঈসায়ী লেখক

বিষয়সূচি

প্রথম কথা
দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্ব
দাজ্জালের পরিচিতি
দাজ্জাল সম্বন্ধে অন্যান্য হাদীস
বাইবেলে দাজ্জাল
কিন্তু... ... ...
মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থা
প্রকৃত এবাদত
এক অনন্য সুযোগ

লেখক পরিচিতি

আল্লাহর দীন (দীনুল হক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর যে মোজাহেদগণ আরবের মরুপ্রান্তর থেকে এ উপমহাদেশে এসেছিলেন তাদেরই উত্তরসূরী যামানার এমাম (এমামুয্যামান) জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯২৫ সনে টাঙ্গাইলের করটিয়ার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে শবে বরাতের শেষ রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষে তিনি প্রথমে সা'দত কলেজ এবং পরে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হোয়ে পড়েন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী এদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি) নির্বাচিত হন।

বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মোসলেম জগত কোন না কোন পাশ্চাত্য প্রভুর গোলাম। তখন থেকেই একটি প্রশ্ন তাঁর মনে নাড়া দিতে থাকে যে, মুসলমান বোলে পরিচিত জাতিটিই যদি আল্লাহর মনোনীত জাতি হোয়ে থাকে তাহোলে তাদের এই ঘৃণিত দাসত্বের কারণ কি? একসময় আল্লাহর অশেষ রহমে এ প্রশ্নের জবাব তিনি পেতে আরম্ভ কোরলেন। একটু একটু কোরে, সারা জীবন ধোরে তিনি বুঝতে পারলেন কোথায় সেই শুভংকরের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা-- তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হোয়েছে। তিনি বুঝেেলন, চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর প্রকৃত উম্মাহ অর্দ্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন, সেই দীনটি আর আজ আমরা 'এসলাম ধর্ম' বোলে যে দীনটি অনুসরণ করি এই দু'টি দীন পরস্পর-বিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো এসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্ত্তমানের মোসলেম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এসলামের সঠিক আকীদা, তওহীদের মর্মবাণী, এবাদতের অর্থ, মো'মেন, মোসলেম, উম্মতে মোহাম্মদী হবার শর্ত্ত, হেদায়াহ- তাকওয়া, সালাতের (নামায) সঠিক উদ্দেশ্য, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, ৫ দফা কর্মসূচি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদিসহ আরো বহু বিষয় তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারলেন। রসুল ১৪০০ বছর আগে আখেরী যামানায় দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন সেইসব হাদীসের রূপক বর্ণনা থেকে প্রমাণ কোরলেন যে বর্ত্তমান ইহুদী- খ্রীস্টান যান্ত্রিক 'সভ্যতা'ই হোচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর দানব। তিনি তার এ উপলব্ধিগুলি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ কোরলেন এবং প্রকৃত এসলামকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'হেযবুত তওহীদ' নামে একটি আন্দোলনের সূচনা কোরলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক অবস্থানকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ কোরেছেন। তিনি এমন এক পরশপাথর যার সংস্পর্শ মানুষকে জান্নাতের শান্তি দেয়। গত ১৬ বছর ধোরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এ মহান ব্যক্তি

নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হাজার বছরের ফেকাহ, তফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ- সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম) এসলাম চাপা পড়ে রোয়েছে সেই এসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার কোরে মানুষের সামনে উপস্থিত কোরতে। আখেরী যমানায় আবার যখন আল্লাহর দীন কায়েম হবার ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষিত হোয়েছে, ঠিক সেই যমানায় এসে যুগপৎ প্রকৃত এসলামের প্রকাশ ও দাজ্জালের পরিচয় উন্মোচিত হওয়ার ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর এক মহাপরিকল্পনার ইঙ্গিত।

বই পরিচিতি

'দাজ্জাল ? ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা!'- গ্রন্থখানি দাজ্জালের উপর লেখা কোন গতানুগতিক গ্রন্থ নয়। এটি কোরান, হাদীস, বাইবেল ও বিজ্ঞানের আলোকে রচিত বহু দুর্লভ তথ্য- সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। শেষ রসুলের ভবিষ্যদ্বাণীমতে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী মানব অধ্যুষিত পৃথিবীর আখেরী যমানায় বিরাট এক ঘোড়ায় চোড়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হরণকারী এক মহাশক্তিধর এক চক্ষু বিশিষ্ট দানব দাজ্জালের আবির্ভাব ঘোটবে যার পদতলে সমগ্র মোসলেম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে। এমন পরাশক্তিধর দাজ্জালের পরিচিতিমূলক অসংখ্য হাদীসের রূপক বর্ণনা থেকে আল্লাহর অশেষ রহমতে হেযবুত তওহীদের এমাম, এ গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী প্রমাণ কোরতে সক্ষম হোয়েছেন যে দাজ্জাল কোন রূপকথার দৈত্য নয় বরং বর্ত্তমান বস্তুবাদী ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হোচ্ছে রসুল বর্ণিত সেই দানব দাজ্জাল, বাইবেলে যাকে Anti-Christ হিসাবে উল্লেখ করা হোয়েছে।

আল্লাহর রসুল দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচাইতে বৃহৎ ও সংকটজনক ঘটনা বোলে উল্লেখ কোরেছেন এবং এর থেকে তিনি স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কোরেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হোচ্ছে এই জাতির আলেম সমপ্রদায় সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ দাজ্জালের ব্যাপারে আশ্চর্য্যরকম নির্বিকার। এই মহা প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছেন তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী শ্রম ও সময় দিয়েছেন দাড়ি- মোছ, টুপি- পাগড়ী, পাজামা, মেসওয়াক, কুলুখ আর বিবি তালাকের মত তুচ্ছ ফতওয়ার বিশ্লেষণে। ফলে তাদের অজ্ঞাতেই মোসলেম উম্মাহর মহাবিপদের সংকেত বাজিয়ে ৩৭১ বছর আগেই দাজ্জাল জন্মগ্রহণ কোরেছে। সে তার শৈশব কৈশোর পার হোয়ে বর্ত্তমানে যৌবনে উপনীত হোয়েছে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে তার পায়ের নিচে পদদলিত কোরে চোলেছে; আজ সমস্ত পৃথিবীসহ মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিও দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে তার রব, প্রভূ বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।

পৃথিবীর এই চরম ক্রান্তিলগ্নে হেযবুত তওহীদের এমাম দলমত নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান কোরছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হরণকারী এই দানবকে প্রতিহত কোরে আল্লাহ প্রদত্ত "এক অনন্য সুযোগ" গ্রহণ কোরে বদর ও ওহুদের দুই যুদ্ধের শহীদদের সম্মিলিত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করার জন্য। তাই মানবজাতির মুক্তির লক্ষ্যেই এই গ্রন্থখানির প্রচার ও প্রসার অপরিহার্য্য হোয়ে উঠেছে। ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ পাক এই গ্রন্থের দ্বারা দাজ্জালের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে পথহারা বিভ্রান্ত, তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত এই মোসলেম

জনসংখ্যাকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথ দেখাবেন।

বইয়ে ব্যবহৃত বানানরীতি সম্পর্কে আমাদের দু'টি কথা

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা, আপনারা এ বইয়ে প্রচলিত বানানরীতির কিছুটা ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারে আমাদের ব্যাখ্যা হোচ্ছে:-

প্রথমত, কোন কোন শব্দ যেভাবে মুখে উচ্চারণ করা হয় সেভাবে লেখা হয় না, আবার যেভাবে লেখা হয় সেভাবে মুখে উচ্চারণ করা হয় না। যেমন 'করি' শব্দটি উচ্চারণের সময় ক্+ও=কো করা হয় কিন্তু লেখার সময় লেখা হয় ক্+অ=ক। এতে লেখা এবং বলার মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যায়। যেমন: বইয়ের ৯ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম কোরে দেবেন। এই 'করে' এবং 'কোরে' দু'টো শব্দের জন্য যদি একই বানান অর্থাৎ 'করে' লেখা হয় তাহোলে উচ্চারণ কেমন হবে? এ অসামঞ্জস্য দূর করার জন্যই লেখক করে, বলে, হয়েছে, হল ইত্যাদির বদলে কোরে, বোলে, হোয়েছে, হোল ইত্যাদি বানান ব্যবহার কোরেছেন।

দ্বিতীয়ত, আরবী শব্দের বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির উচ্চারণে ভুল রোয়েছে। আরবী যে বর্ণের নিচে 'যের' থাকবে বাংলায় সেখানে এ- কার (এ, অ), এবং খাড়া 'যের' বা 'ইয়া' যুক্ত থাকবে সেখানে ই বা ঈকার (/ ী) ব্যবহার কোরতে হবে।

শুদ্ধ বানান	প্রচলিত বানান	শুদ্ধ বানান	প্রচলিত বানান
বেসমেল্লাহ	বিসমিল্লাহ	এলাহ	ইলাহ
এসলাম	ইসলাম	মোসলেম	মুসলিম

লেখকের ব্যবহৃত এ বানানরীতি নতুন কিছু নয়। মাত্র ৩০/৪০ বছর আগেও সর্বত্র আরবী 'যের' এর উচ্চারণ এ- কার দিয়েই করা হোত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা আকরাম খাঁ রচিত বিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটিতেও ইসলামের বানান 'এছলাম'-ই লেখা হোয়েছে। তিনি একা নন, তার সমসাময়িক সবাই এভাবেই লিখতেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামও তার নামের বানানে 'এসলাম' লিখতেন। তখনকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার নাম ছিলো 'মোসলেম ভারত' যা সকলেই অবগত আছেন। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত অভিধানে 'ইসলাম' এবং 'এসলাম' দুটো বানানই উল্লেখ করা হোয়েছে। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি এখনো আরবি বর্ণমালা পড়েন - আলিফ, বে, তে, সে এভাবে। এমনকি আমরাও অনেক আরবী শব্দ এ- কার এবং ও- কার দিয়ে উচ্চারণ কোরি। যেমন: মোবারক, কাফের, মোশরেক, আলেম, জালেম, এবাদত, গায়েব, এশা, মাহে রমজান, হাফেজ ইত্যাদি। কিছুদিন হোল আরবী থেকে এই এ- কার (ে) এবং ও- কার (ো) এর ব্যবহার বাদ দেওয়া হোচ্ছে। এ পদ্ধতি যারা চালু কোরেছেন তারা শুধু যে একটি ভুলই কোরেছেন তাই নয়, তারা পুরো আরবী ভাষা থেকে দু'টি উচ্চারণই [এ (ে) এবং ও (ো)] বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এমনিতেই আরবী ভাষা উচ্চারণের (Phonetics) দিক থেকে খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়; চ, ট, ঠ, থ, প, ড় ইত্যাদি অনেক অনেক উচ্চারণই এ ভাষায় নেই। তার মধ্যে এ ভাষা থেকে 'এ' (A) এবং ও (O) - কারের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ উঠিয়ে দিয়ে আরবী ভাষাকে আরো দরিদ্র করা হোচ্ছে। তাই লেখক আরবী ভাষার চিরাচরিত ও শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারেই আরবী শব্দের বানান লিখেছেন।

আশা কোরি সুহৃদ পাঠক আমাদের এ বানানরীতি ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারবেন। -

প্রকাশক

লেখকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী অন্যান্য বই

- এ ইসলাম ইসলামই নয়
- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- বাঘ- বন- বন্দুক

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

প্রথম কথা

চৌদ্দশ' বছর থেকে মোসলেম উম্মাহর ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনা চোলে আসছে। আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব কথা বোলে গেছেন, পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘোটবে সেগুলি সম্বন্ধে আভাষ ও সরাসরি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বিগ্নকর। উদ্বিগ্নকর ও ভীতিপ্রদ এই জন্য যে দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তিসমগ্র মানবজাতির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার কোরে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, সমস্ত মানবজাতিকে বিপথে চালাবার চেষ্টা কোরবে। শুধু চেষ্টা নয়, বেশ কিছু সময়ের জন্য দাজ্জাল তার শক্তি ও প্রভাব বিস্তার কোরে **গোটা মানবজাতিকেই বিপথে পরিচালিত কোরবে।** কাজেই দাজ্জাল কে কোনভাবেই ছোট কোরে দেখার বা অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **আদমের সৃষ্টি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোন বিষয় বা ঘটনা হবে না, যা দাজ্জালের চেয়ে গুরুতর ও সংকটজনক** (হাদীস- এমরান বিন হোসায়েন (রাঃ) থেকে মোসলেম)। তিনি এ কথাও বোলেছেন যে- **নুহ (আঃ) থেকে নিয়ে কোন নবীই বাদ যান নি যিনি তাঁর উম্মাহকে দাজ্জাল সম্বন্ধে সতর্ক করেন নি** (হাদীস- আবু ওবায়দা বিন যার্‌রাহ (রাঃ) ও আব্দুলাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে আবু দাউদ, বোখারী, মোসলেম ও তিরমিযি)। শুধু তাই নয়, আল্লাহর নবী নিজে দাজ্জালের সংকট (ফেত্‌না) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (হাদীস- আয়শা (রাঃ) থেকে বোখারী)।

চিন্তা করার বিষয় হোচ্ছে, যে ব্যাপারটা মানবজাতির সৃষ্টি থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত যা কিছু ঘোটবে সে সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ, যে বিষয় সম্বন্ধে নুহ (আঃ) ও তাঁর পরবর্ত্তী প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে সতর্ক কোরে গেছেন এবং যা থেকে শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও আল্লাহর কাছে আশ্রয় (পানাহ্) চেয়েছেন সেটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, বিরাট (হাদীসে বিশ্বনবী "আকবর" শব্দ ব্যবহার কোরেছেন) এবং আমরা সে সম্বন্ধে কতটুকু সজাগ ও সচেতন? বাস্তব অবস্থা এই যে আমরা মোটেই সজাগ নই এবং নই বোলেই আমরা বুঝছিনা যে **৪৭৪ বছর আগেই দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে এবং সে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্ত্তমানে যৌবনে আছে এবং এও বুঝছিনা যে সমস্ত পৃথিবীসহ আমরা মোসলেমরাও দাজ্জাল কে রব, প্রভু বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছি ও তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছি।** প্রকৃত দীন থেকে বিচ্যুত হবার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ এই জাতিকে (যেটা নিজেদের মোসলেম বোলে পরিচয় দেয় ও নিজেদের মোসলেম বোলে বিশ্বাস করে) কয়েক শতাব্দীর জন্য ইউরোপের খৃষ্টান জাতিগুলির দাসে পরিণত কোরে দিয়েছিলেন এবং ঐ দাসত্বের সময়ে প্রভুদের প্রবর্তিত শিক্ষার ফলে প্রকৃত দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে আছে। কাজেই দাজ্জাল সম্বন্ধে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এরা আব্রাহাম লিংকনের কয়টা দাঁত ছিলো তা জানেন, শেক্সপিয়ের থেকে অনর্গল আবৃত্তি কোরতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর রসুল যে মানবজাতির জীবনে দাজ্জাল নামে এক মহাবিপদ আবির্ভূত হবার ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন তা তাদের কাছে এক কৌতুকপূর্ণ সংবাদ। এই জাতির যে অংশটা

কোরান-হাদীস পড়েন তারা ছাড়া দাজ্জাল সম্বন্ধে কেউ চিন্তা-ভাবনাও করেন না, কোন গুরুত্বও দেন না। ঐ যে অংশটা কোরান-হাদীস নাড়াচাড়া করেন সেই অংশও দাজ্জাল কে নিয়ে মাথা ঘামান না, প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল কী তা বুঝতে চেষ্টা করেন না; কারণ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তারা অপেক্ষায় আছেন যে আখেরী যমানায় বিরাট এক ঘোড়ায় চড়ে এক চক্ষু বিশিষ্ট এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে। যে হাদীসগুলিতে রসুলাল্লাহ দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন সেগুলির শাব্দিক অর্থকেই তারা গ্রহণ কোরেছেন, তার বেশী আর তারা তলিয়ে দেখেন নি বা দেখতে পারেন নি। যে ঘটনাটিকে আখেরী নবী **আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা** বোলে চিহ্নিত কোরেছেন সেই মহা-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে তারা কোনও গভীর গবেষণা করেন নি। এই মহা-প্রয়োজনীয় ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য যতটুকু শ্রম দিয়েছেন তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী শ্রম ও সময় দিয়েছেন দাড়ি-মোছ, টুপি-পাগড়ী, পাজামা, মেসওয়াক, কুলুখ আর বিবি তালাকের মত তুচ্ছ ফতওয়ার বিশ্লেষণে।

অন্যান্য সবার মত আমিও অপেক্ষায় ছিলাম আখেরী যমানায় বিরাট আকারের এক ঘোড়ায় উপবিষ্ট এক চোখ অন্ধ এক দানবের, এবং তার রব, প্রভু হবার দাবির। এই আকীদায় প্রথম ধাক্কা পেলাম মোহাম্মদ আসাদ নামের এক ভদ্রলোকের লেখা রোড টু মেক্কা (Road to Mecca) বইটিতে। এই লেখকের নাম ছিলো Leopold Weiss (লিওপোল্ড ওয়াইস), ইনি অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ কোরলেও আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রহমে যুবক বয়সেই দীনুল এসলাম গ্রহণ করেন ও শেষ জীবনে সুন্দর তফসিরসহ কোরানের অনুবাদ করেন যেটা লন্ডন থেকে প্রকাশিত হোয়েছে। দাজ্জাল সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে তিনি তার ঐ বইয়ে বোলেছেন যে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হোচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল । দুঃখের বিষয় মোহাম্মদ আসাদ ঐটুকু বোলেই ক্ষান্ত হোয়েছেন, আর কোন গবেষণা করেন নি। বইটি পড়েছিলাম খৃষ্টীয় উনিশ শ' পঞ্চাশ দশকের শেষ বা ষাট দশকের প্রথম দিকে। তারপর যতই ও সম্বন্ধে ভেবেছি ততই পরিষ্কার হোয়েছে যে মোহাম্মদ আসাদ ঠিকই বুঝেছেন। রসুলাল্লাহর সময়ের নিরক্ষর আরবদের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত কৌশলের ওপর ভিত্তি করা মহাশক্তিশালী সভ্যতা সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা অবশ্যই অর্থহীন হোতো, তাদের পক্ষে তা বোঝা মোটেই সম্ভব ছিলো না। তাই আল্লাহর নবী এটাকে তাদের কাছে রূপকভাবে (Allegorically) বর্ণনা কোরেছেন। চৌদ্দশ' বছর আগের নিরক্ষর আরবদের পক্ষে সম্ভব না হোলেও বর্ত্তমানে দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যাচাই কোরলে সন্দেহের কোন স্থান থাকে না যে **মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হোচ্ছে আল্লাহর রসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল ।**

বিশ্বনবীর দাজ্জাল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলির উৎস হোচ্ছে হাদীস। সবাই জানেন যে হাদীসের বেশ কয়েকটি শ্রেণী আছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি; প্রথম শ্রেণী হোল সহিহ অর্থাৎ সঠিক। দ্বিতীয় হোল হাসান, এটাও সঠিক কিন্তু প্রথম শ্রেণীর মত নয়। তৃতীয় হোল দয়ীফ্ অর্থাৎ দুর্বল, কিন্তু দয়ীফ্ হোলেও গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও হাদীসের গরীব, মুনকার, মা'রুফ ইত্যাদি আরও অনেক শ্রেণী আছে। **হাদীসের সত্যতা-অসত্যতা যাচাইয়ের কঠিন প্রক্রিয়ায় যেমন বহু অসত্য, বানোয়াট হাদীস পরিত্যক্ত হোয়েছে, তেমনি অনেক সত্য হাদীসও সত্য হওয়া সত্ত্বেও এসনাদের অভাবে বাদ পোড়ে গেছে।** কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ ধারণা করার জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়টি (Subject) সম্বন্ধে সহিহ, হাসান, দয়ীফ, এমন কি পরিত্যক্ত হাদীসও পর্যালোচনা কোরে একটি সম্যক ধারণা করা। তাতে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র

মনে ফুটে ওঠে। দাজ্জাল সম্বন্ধে আলোচনাতেও আমি এই নীতিই গ্রহণ কোরেছি, যদি ভিত্তি অবশ্যই রোয়েছে সহিহ হাদীসগুলির ওপর।

দাজ্জাল সম্বন্ধে মহানবীর হাদীসগুলিকে আমি দু'টো ভাগে ভাগ কোরেছি। একটা ভাগ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে, অন্যটি দাজ্জালের পরিচয়জ্ঞাপক। মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ বিপদের সম্বন্ধে মানুষ বেখেয়াল নিরুদ্বেগ। যারা ধর্মের ব্যাপারে মহা- আলেম হোয়েছেন ও ধর্মচর্চার মধ্যে ডুবে আছেন তারাও সংকীর্ণ ও প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য দেখতে ও বুঝতে সক্ষম হন নি যে দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতি ধ্বংসকারী নুহের (আঃ) মহাপ্লাবনের চেয়েও, প্রলয়ঙ্করী বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও কেন বড় (আকবর) ঘটনা; কেন মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের (যদি সে ঘটনা সত্য হোয়ে থাকে) চেয়েও সাংঘাতিক, যে যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী অর্থাৎ প্রায় এক কোটি আদম সন্তান নিহত হোয়েছিলো। অন্য ভাগের হাদীসগুলিতে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতি যেন দাজ্জাল কে ঠিকভাবে চিনতে পারে ও সাবধান হয়, দাজ্জাল কে প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরোধিতা করে, সে জন্য তার পরিচিতির জন্য চিহ্নগুলি বোলেছেন। কিন্তু তার সময়ের মানুষের শিক্ষার স্বল্পতার জন্য তাঁকে বাধ্য হোয়ে দাজ্জাল কে রূপকভাবে বর্ণনা কোরতে হোয়েছে। কিন্তু সে রূপক বর্ণনা আজ পরিষ্কারভাবে ধরা দিয়েছে, যদিও আমাদের প্রায়ান্ধ দৃষ্টির জন্য সে বর্ণনাও আমরা বুঝতে সক্ষম হোচ্ছি না, দাজ্জাল কে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ও দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পোড়ে থেকেও বুঝতে পারছিনা যে এই সেই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল , মাসীহ উল কায্যাব।

প্রথমেই দাজ্জালের নামটাকে নেয়া যাক। আল্লাহর রসুল একে দাজ্জাল নামে অভিহিত কোরেছেন। কিন্তু এটা কোন নাম নয়, এটা একটা বর্ণনা, অর্থাৎ বিষয়টার বর্ণনা। যেমন এমাম মাহ্দী কোন নাম নয় বর্ণনা। মাহ্দী অর্থ হেদায়াহ প্রাপ্ত, যিনি সঠিক পথ, হেদায়াহ পেয়েছেন, তাঁর নিজের অন্য নাম থাকবে সবার মত। তেমনি দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত। যেমন মাকাল ফল, দেখতে অতি সুন্দর, মনে হবে খেতেও অতি সুস্বাদু, কিন্তু আসলে খেতে বিস্বাদ, তিক্ত। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ কোরে ফেলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবিচারে, দুঃখে, ক্রন্দনে, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত কোরেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন ছোট খাটো যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। বিধবা, সন্তানহারা, গৃহহারা, দেশত্যাগীদের কোন হিসাব নেই। আর এই নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা কোরেছে দশ লক্ষ মানব। ইরাক ছাড়াও আফগানিস্তানসহ আরও অনেকগুলো দেশে তার এই হত্যাযজ্ঞ আজও চোলছে। এই 'সভ্যতা'র অধীনস্ত সমস্ত পৃথিবীতে খুন, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, অত্যাচার সীমাহীন এবং প্রতিদিন প্রতি দেশে ধাঁ ধাঁ কোরে বেড়ে চোলেছে। তাই এর নাম দাজ্জাল চাকচিক্যময়, চোখ ধাঁধানো প্রতারক।

দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্ব

এক ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **আদমের সৃষ্টি থেকে নিয়ে শেষদিন (অর্থাৎ কেয়ামত) পর্যন্ত যা কিছু ঘোটেছে ও ঘোটবে তার মধ্যে দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কিছু ঘোটবে না।** [এমরান বিন হোসায়েন (রাঃ) থেকে মোসলেম]

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীস, কারণ দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বোঝাতে যেয়ে বিশ্বনবী শব্দ ব্যবহার কোরেছেন 'আকবর', অতি বড়। আরও গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আদমের (আঃ) সৃষ্টি থেকে কেয়ামত অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হওয়াটা কম কথা নয়, নিঃসন্দেহে বলা যায় সাংঘাতিক, কারণ মানবজাতির জীবনে নুহের (আঃ) সময়ে মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যেয়ে মানবজাতিসহ সব প্রাণী, পশুপক্ষী ধ্বংস হোয়ে গিয়েছিলো। দু'টি বিশ্বযুদ্ধে অল্প সময়ের মধ্যে কমপক্ষে চৌদ্দ কোটি মানব হতাহত হোয়েছে, ইতিহাসের আগে আরও অমন সর্বনাশা বিপর্যয় হয়তো হোয়েছে। অথচ মহানবী বোলছেন, ও সব কিছুর চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার হবে দাজ্জালের আবির্ভাব। মানবজাতির অতীতে কি কি ঘটনা ঘোটেছে তা আল্লাহ তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন, কোরানই তার প্রমাণ আর ভবিষ্যতে কি কি ঘোটবে তাও যে তাঁর রসুল জানতেন তার প্রমাণ দাজ্জাল ও অন্যান্য বহু ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। **দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বলার সময় অতীতে নুহের (আঃ) মহাপ্লাবনের কথা বা ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধের কথা তাঁর মনে ছিলো না এ কথা অসম্ভব।** কারণ তিনি সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসুল, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ভেবেচিন্তে বলা। কাজেই এ এক সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং এমন মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী যা অব্যর্থ, মিথ্যা হোতেই পারেনা। অথচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা বেখেয়াল, উদাসীন কিন্তু এর চেয়ে তুচ্ছ হাজারও বিষয় নিয়ে তুলকালাম কোরছি। এবার দেখা যাক দাজ্জাল অর্থাৎ **জড়বাদী, যান্ত্রিক ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার (Materialistic, Technological Judeo-Christian Civilization) আবির্ভাব মানবজাতির জীবনে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা কেন?** এর গুরুত্ব ঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের আদমের (আঃ) অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টির সময়ে ফিরে যেতে হবে।

মহাকাশ, সেই মহাকাশে অগণ্য ছায়াপথ (Galaxy), নীহারিকা (Nebula), অসংখ্য সূর্য্য, চাঁদ, গ্রহ, এক কথায় এই মহাবিশ্ব আজ পর্যন্ত যার শেষ পাওয়া যায়নি, তা শুধু 'কুন' আদেশ দিয়ে সৃষ্টি করার পর আল্লাহর ইচ্ছা হোল এমন একটি সৃষ্টি করার যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকবে। এই বিপুল, বিরাট মহাবিশ্বের প্রতি অণু- পরমাণু তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়মে চোলছে, ঐ নিয়ম থেকে একটি চুলের কোটি ভাগের এক ভাগও সরে যাবার ক্ষমতা বা শক্তি কারো নেই, সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কাউকে আল্লাহ দেন নি। এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তিনি তাঁর মালায়েকদেরও দেন নি; যে মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা থেকে এক পরমাণু পরিমাণও ভ্রষ্ট হবার শক্তি তাদের দেন নি। এবার তাঁর ইচ্ছা হোল **তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে দিয়ে দেখা ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে কি করে** (কোরান- সুরা দাহর, আয়াত ২, ৩)। তাই আল্লাহ সৃষ্টি কোরলেন আদমকে (আঃ)।

যেহেতু এর দেহের ভেতর তিনি তাঁর নিজের আত্মা স্থাপন কোরবেন, সেই সম্মানে আদমের দেহ তিনি তৈরি কোরলেন 'কুন' আদেশ দিয়ে নয়, তাঁর নিজের হাতে (কোরান- সুরা সা'দ, আয়াত ৭৫)। তারপর তার দেহের মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে (প্রবেশ কোরিয়ে) দিলেন (কোরান- সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২)। আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা, যেটাকে তিনি বোলছেন আমার আত্মা, সেটা থেকে আদমের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া অর্থ আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ, চরিত্র আদমের মধ্যে চোলে আসা। আল্লাহর রূহ্ আদমের অর্থাৎ মানুষের ভেতরে চোলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের চেয়ে বহু ঊর্দ্ধে উঠে গেলো, কারণ তার মধ্যে তখন স্বয়ং আল্লাহর সমস্ত সিফত্সহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এসে গেলো যা আর কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। সে হোয়ে গেলো আশরাফুল মাখলুকাত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর রূহ্ যে তিনি মানবের দেহের ভেতর স্থাপন কোরলেন **এটাই হোল মানুষের কাছে তাঁর আমানত**, যে আমানত মানুষ ছাড়া আর কারো কাছে নেই (কোরান- সুরা আহযাব, আয়াত ৭২)।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে মানুষ কি করে সে পরীক্ষা কোরতে গেলে অবশ্যই একটি বিরুদ্ধশক্তি প্রয়োজন, না হোলে পরীক্ষাই অর্থহীন, খালি মাঠে গোল দিলে তো আর পরীক্ষা হয় না, তাই আল্লাহ দাঁড় করালেন এবলিসকে। তাকে শক্তি দিলেন মানুষের দেহমনের মধ্যে ঢুকে কুপরামর্শ দিয়ে তাকে প্রভাবিত ও পথভ্রষ্ট করার। আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন এবলিস মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। আদম অর্থাৎ আল্লাহর খলীফা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মালায়েকদের মতামত জানতে চাইলে এবলিসসহ তারা সবাই বোলেছিলো- কেন আদম সৃষ্টি কোরতে চাও? আমরাইতো তোমার গুণকীর্ত্তণের জন্য যথেষ্ট, **তোমার এ সৃষ্টিতো ফাসাদ (অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) আর সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ, মারামারি, রক্তপাত) কোরবে** (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। এখানে প্রশ্ন আসে- আল্লাহ তখনও আদমকে সৃষ্টিই করেননি। শুধু বোলেছেন সৃষ্টি কোরতে চাই, এটুকু শুনেই মালায়েকরা কি কোরে বললো, সৃষ্টি করার পর এই নতুন সৃষ্টিটি কি কোরবে? এর জবাব হোচ্ছে আল্লাহ যদি শুধু এইটুকু বোলতেন যে আমি আদম নামে একটি জীব সৃষ্টি কোরতে চাই তবে মালায়েকরা কিছুই বোলতো না। কিম্বা হয়তো বলতো প্রভু! তুমি লক্ষ কোটি সৃষ্টি কোরেছো, আরও একটি কোরবে, এতে আমাদের কী বলার আছে? তোমার ইচ্ছা হোলে করো। কিন্তু আল্লাহ তা বলেন নি, তিনি বোলেছিলেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি কোরতে চাই (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। এই **খলিফা** শব্দ থেকেই মালায়েকরা বুঝে গেল যে এই নতুন সৃষ্টিটি তাদের মত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিহীন একটি সৃষ্টি হবে না কারণ খলীফা অর্থ প্রতিনিধি, এবং প্রতিনিধি অর্থ হোল যার প্রতিনিধি তার শক্তি তার মধ্যে অবশ্যই থাকা, কমই হোক, বেশীই হোক। তারা বুঝলো এই নতুন সৃষ্টি আদমের অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে থাকবে আল্লাহর সিফত, আল্লাহর গুণসমূহ যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অন্তর্ভুক্ত। **স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকা অর্থই হোচ্ছে আল্লাহর দেখানো পথ, হেদায়াহ মানা বা সেটা না মেনে নিজের ইচ্ছামত পথে চলার শক্তি।** আর আল্লাহর দেখানো পথে না চোলে নিজের তৈরী পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ফাসাদ (সমাজের মধ্যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) এবং সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা, রক্তপাত) তাই মালায়েকরা আদমকে সৃষ্টির আগেই সে কথা বোলতে পেরেছিলো।

অতি সংক্ষেপে এর পরের ঘটনাগুলি হোচ্ছে এই যে, আদমের (আঃ) অর্থাৎ মানুষের দেহ নিজ হাতে তৈরী কোরে তার দেহের ভেতরে আল্লাহর নিজের রূহ, আত্ম থেকে ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ মালায়েকদের আদেশ কোরলেন আদম অর্থাৎ মানুষকে সাজ্‌দা কোরতে (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩৪; সুরা আ'রাফ, আয়াত ১১)। এবলিস অস্বীকার কোরলো ও আল্লাহকে বোললো আমরা মালায়েকরা বোলেছিলাম তোমার এই নতুন সৃষ্টি এই আদম, তোমার এই খলীফা পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর যুদ্ধ, মারামারি, রক্তপাত কোরবে। আমাদের এই কথা যে সত্য তা প্রমাণ কোরে দেখাবো। আল্লাহ এবলিসের অর্থাৎ শয়তানের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরলেন, কারণ তাঁর খলীফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিলো তাই পরীক্ষা করা যে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিধর খলীফা কোন্ পথে চলে তা দেখা। এবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরে তিনি এই নতুন খেলার নিয়মকানুন, শর্ত্ত ইত্যাদি নির্দিষ্ট কোরে দিলেন। সেগুলো হোল মোটামুটি এই:-

ক) এবলিসকে অনুমতি ও শক্তি দেওয়া গেলো যে সে আল্লাহর খলীফা আদমের দেহে, মন-মগজে, শিরা- উপশিরায় প্রবেশ কোরতে পারবে ও তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবে।

খ) আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে তাঁর নবী- রসুলদের পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ অর্থাৎ পথ প্রদর্শন কোরবেন (কোরান- সুরা উনুস, আয়াত ৪৭; সুরা নহ্‌ল, আয়াত ৩৬; সুরা রা'দ, আয়াত ৭)। সে হেদায়াহ হোল তওহীদ, জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন- কানুন, আদেশ- নিষেধ অস্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁরই আদেশ- নিষেধ পালন করা।

এরপর বনি আদমের সম্মুখে **সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার জন্য দু'টি মাত্র পথ খোলা রোইলো।** হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার কোরে নবী- রসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধানকে (দীন) সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা অথবা এবলিসের পরামর্শ মেনে নিয়ে **স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার কোরে** নিজেদের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরে নিজেরাই আইন- কানুন তৈরী কোরে সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করা। তৃতীয় কোন পথ রোইলো না।

এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী বনি আদমকে পরিস্থিতি ভালো কোরে বুঝে নেবার জন্য আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিলেন যে- ঐ দুই পথের মধ্যে যে বা যারা তাঁর সার্বভৌমত্বকে (Sover ei gnt y) স্বীকার কোরে নিয়ে নবী- রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন- কানুন, আদেশ- নিষেধকে তাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ কোরবে তাদের তিনি গ্রহণ কোরবেন, ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধ, গোনাহ মাফ কোরে তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি সমস্ত কোরানে ও সহিহ হাদীসে ছড়িয়ে আছে। এটাকে আরও পরিষ্কার কোরে বুঝিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর রসুল তাঁর বিশিষ্ট সাহাবা আবু যরকে (রাঃ) বোললেন- যে লোক মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর তওহীদের ওপর অটল থাকবে সে ব্যভিচারী ও চোর হোলেও জান্নাতে প্রবেশ কোরবে (হাদীস- আবুযর গেফারী (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম)।

এ ছাড়াও তিনি বহুবার বহুভাবে এ কথা পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন যে- আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, সেরাতুল মুস্তাকীমে অর্থাৎ তওহীদে যে অটল থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার পৃথিবী ভর্ত্তি গোনাহও তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। এ ব্যাপারে বোখারী, মোসলেমসহ অসংখ্য

হাদীস পেশ করা যায়। আল্লাহর নবী বোলেছেন- **বান্দাদের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Cont r act) হোচ্ছে যে তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানবে না, তাহোলেই আল্লাহ তাদের কোন শাস্তি দেবেন না** (জান্নাতে প্রবেশ করাবেন); (হাদীস- মো'য়াজ (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম)।

তিনি আরও বোলেছেন- **যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম কোরে দেবেন** (হাদীস- ওবায়দাহ বিন সোয়ামেত (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম)। আল্লাহর রসুল আরও বোলেছেন- **জান্নাতের চাবী হোচ্ছে তওহীদ** (হাদীস- মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে আহমদ)। এখানে মনে রাখতে হবে যে **এই তওহীদ বর্ত্তমানের ব্যক্তিজীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ** অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

এই তওহীদের বিপরীতে শেরক ও কুফর সম্বন্ধে আল্লাহ বোলেছেন আমার ইচ্ছা হোলে আমি মানুষের সমস্ত গোনাহ, অপরাধ ক্ষমা কোরে দেবো, কিন্তু শেরক ও কুফর ক্ষমা কোরবো না। কুফর হোচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সরাসরি অস্বীকার কোরে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য আইন- কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি তৈরী কোরে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা, আর শেরক হোল আল্লাহকে আংশিকভাবে স্বীকার কোরে ও আংশিকভাবে অস্বীকার কোরে জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত আইন- কানুন বা নিয়ম- পদ্ধতি তৈরী কোরে সেইমত চলা। জীবনের যে কোন একটি মাত্র অঙ্গনেও আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোন আইন মানা শেরক। **আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোয়েছেন যে তিনি শেরক** (তাকে আংশিকভাবে অস্বীকার করা) **ও কুফর** (তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা) **কখনও ক্ষমা কোরবেন না** (কোরান- সুরা নেসা, আয়াত ৪৮, ১১৬ ও সুরা মোহাম্মদ, আয়াত ৩৪)।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে যারা সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যে সত্যিকারভাবে স্বীকার কোরে নিলো তারা তওহীদ গ্রহণ কোরলো, সেরাতুল মুস্তাকীমে যাত্রা শুরু কোরলো, দীনুল কাইয়্যেমাতে কায়েম হোল- **তারা পৃথিবীপূর্ণ ব্যক্তিগত গোনাহ নিয়েও আল্লাহর সামনে হাযির হোলে আল্লাহ সব ক্ষমা কোরে তাদের জান্নাত দেবেন (**হাদীস- আবুযর (রাঃ) থেকে তিরমিযি, তিবরানী ও বায়হাকী)। অন্যদিকে ঐ তওহীদে যারা নেই অর্থাৎ সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নাই, বা আংশিকভাবে কোরেছে, তারা ব্যক্তিজীবনে যত সওয়াব ও পুণ্যের কাজই করুক আল্লাহ তা গ্রহণ কোরবেন না, তাদের জাহান্নামে দেবেন। অর্থাৎ **সমষ্টিগত ও সার্বিক তওহীদ ব্যক্তিগত জীবনের সৎকাজ, তাকওয়ার পূর্বশর্ত্ত, ওটা না থাকলে পৃথিবীপূর্ণ নেক কাজ, সারারাত্রির নামায, সারা বছরের রোযা নিষ্ফল (**কোরান- সুরা আনআম, আয়াত ৮৮, এবং সুরা যুমার, আয়াত ৬৫ ও হাদীস)।

আল্লাহর খলিফা আদমকে (আঃ) তৈরী করার বিরুদ্ধে এবলিস ও মালায়েকদের যে যুক্তি ছিলো তা হোল এই যে, আদম অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে ফাসাদ (অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত অর্থাৎ যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা) কোরবে (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩০)। এবলিস ও মালায়েকরা এ কথা বলে নি যে মানুষ নামায পড়বে না, রোযা রাখবে না, যাকাহ দেবে না, হজ্ব কোরবে না, তারা চুরি, ডাকাতি ব্যভিচার কোরবে, মদ খাবে, জুয়া খেলবে। তারা যে দু'টো কারণ বোলেছিলো **সে দু'টোই সমষ্টিগত**

প্রশ্ন, ব্যক্তিগত নয় এবং একটু চিন্তা কোরলেই দেখা যায় যে মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে এই দু'টি সমষ্টিগত সমস্যাই আজ পর্যন্ত চোলে আসছে এবং আজও এর সমাধান করা যায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্‌স্ (League of Nations) তৈরী কোরেও নয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (United Nations) গঠন কোরেও নয়। কারণ সোজা- আল্লাহ মানুষকে অতি অল্প জ্ঞান দিয়েছেন, সে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য জানে না; সৃষ্টির কেন, তার নিজের দেহ ও মন কেমন কোরে কাজ করে তাও সে ভালো কোরে বোঝে না। কাজেই মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব যে সে এমন একটা জীবন- বিধান, জীবন- ব্যবস্থা, সংবিধান তৈরী কোরবে যেটা মেনে চোললে তার সমষ্টিগত জীবনে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা না থাকে। **এর একমাত্র সমাধান হোচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার কোরে নবী- রসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত জীবন- বিধান (দীন) সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা।**

সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরে যখন তাকে মানুষের দেহ- মনের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ কোরে মানুষকে প্রভাবিত ও প্ররোচিত (ওয়াসওয়াসা) করার অনুমতি দিলেন তখন এবলিস আল্লাহকে বললো- **আমি তোমার সেরাতুল মুস্তাকীমের ওপর তাদের (আদম সন্তানের) জন্য ওঁৎ পেতে থাকবো।** সেখান থেকে আমি তাদের ওপর সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে আক্রমণ কোরবো (সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার জন্য); (কোরান- সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬- ১৭)। আদম সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তির মধ্যে যেমন এবলিস নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাহ ও অন্যান্য এবাদত করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টার কথা বলে নি, মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার চেষ্টার কথা বলে নি, আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করার সময়ও এবলিস ওগুলোর কোন কথাই বললো না, বললো আদমকে তোমার দেয়া সেরাতুল মুস্তাকীমের সহজ সরল রাস্তায় আমি ওঁৎ পেতে বোসে থাকবো, তোমার সৃষ্ট আদম, বনি- আদম যখন ও পথে চোলবে তখন আমি তার সম্মুখ থেকে, পেছন থেকে, ডাইনে থেকে, বামে থেকে অর্থাৎ চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ (Ambush) কোরবো তাকে তোমার ঐ সহজসরল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। তাহোলে দেখা যাচ্ছে **বনি আদমকে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাহ ইত্যাদি এবাদত থেকে বিরত করা বা গোনাহে লিপ্ত করাই এবলিসের লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য হোচ্ছে মানুষকে সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করা।** সুতরাং সেরাতুল মুস্তাকীম নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের চেয়ে বা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

কী এই সেরাতুল মুস্তাকীম? কী এই সহজসরল পথ? এর নাম সহজসরল কেন? **এর পরিষ্কার জবাব হোচ্ছে- তওহীদ, সর্বব্যাপী তওহীদ, জীবনের সর্ব অঙ্গনের (Facet), সর্ব বিভাগের তওহীদ।** সামগ্রিক জীবনের কোন অঙ্গনে আল্লাহর দেয়া আইন- কানুন (শরিয়াহ) ছাড়া আর কাউকে, কোন কিছুকে না মানা, এই সহজসরল কথা। এই জন্যই আল্লাহর রসুল আল্লাহর ঐ নীতিকে (সুন্নাতাল্লাহ) ব্যাখ্যা কোরে বোলেছেন যে, যাদের ঐ সেরাতুল মুস্তাকীম অর্থাৎ তওহীদ থেকে এবলিস বিচ্যুত কোরতে পারবে না তারা জীবনে যত বড় গোনাহই করুক, এমন কি এই দীনে যে দু'টি মহাপাপের শাস্তি সর্বোচ্চ, অর্থাৎ ব্যভিচার ও চুরি, সে দু'টি কোরলেও আল্লাহ তা মাফ কোরে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ঐ সঙ্গে বিশ্বনবী মাটিতে একটি সরল রেখা টেনে বোললেন- এই হোচ্ছে আল্লাহর রাস্তা, সেরাতুল মুস্তাকীম। তারপর তিনি ঐ সোজা রেখা থেকে দুই দিকে কতগুলি রেখা টেনে বোললেন- এগুলি ঐ সমস্ত রাস্তা যে রাস্তায় যাবার জন্য শয়তান ডাকতে থাকবে। এই বোলে তিনি কোরান থেকে পড়লেন- **"নিশ্চয়ই এই হোচ্ছে আমার**

(আল্লাহর) সহজ, সরল পথ। এই পথে চলো, অন্যান্য পথে চোল না। কারণ ঐ সব পথ তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত কোরে দেবে" (হাদীস- আব্দুলাহ বিন মাসুদ (রাঃ) থেকে আহমদ, নেসায়ী, মেশকাত)।

পেছনে বোলে এসেছি মালায়েকরা (এবলিস যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো) মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যে দু'টি যুক্তি আল্লাহর কাছে পেশ কোরেছিলো, অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা দু'টোই সমষ্টিগত বিষয়, ব্যক্তিগত নয়। ফাসাদ শব্দের মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বরকমের অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি এসে যায়। আর সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ রক্তপাত শব্দের মধ্যে মারামারি, সংঘর্ষ, ছোট বড় যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ সব এসে যায়। অর্থাৎ এবলিস আল্লাহকে যে চ্যালেঞ্জ দিলো তার পরিষ্কার অর্থ হোল, 'তোমার খলীফা অর্থাৎ বনি- আদম, মানবজাতিকে আমি ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমায় পতিত করাবো এবং তা করাতে গেলে আমাকে মানুষকে তোমার এবাদত করা থেকে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাহ ও অন্যান্য সওয়াবের কাজ থেকে বিরত করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র তাকে সেরাতুল মুস্তাকীম, তোমার তওহীদ, তোমার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্যুত কোরতে পারলেই তো সে অবশ্যম্ভাবীভাবে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে, আর তা হোলেই তো আমার কেল্লা ফতেহ হোয়ে গেল। **তোমার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্যুত করার পর সে যত খুশি নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাহ কোরতে থাকুক আমার কোন আপত্তি নেই**, কারণ আমার চ্যালেঞ্জে তো আমি জিতে গেলাম। এই জন্যই এবলিস কখনো আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দেয় নি যে, আদমকে এবাদত থেকে বিরত করাবার, বা গোনাহে লিপ্ত করাবার চেষ্টা কোরবে, সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে সেরাতুল মুস্তাকীমের, তওহীদের, সহজ- সরল রাস্তা থেকে আদমকে বিচ্যুত করাবার। এর বিপরীতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলেন- আমার তওহীদকে, আমার সার্বভৌমত্বকে যে বা যারা স্বীকার কোরে নেবে, তা থেকে বিচ্যুত হবে না তারা কত এবাদত কোরেছে, তারা কত গোনাহ কোরেছে, কিছুই আমি দেখবো না, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো, তারা ব্যভিচার ও চুরি কোরলেও (আবু যর (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম এবং আরও অসংখ্য হাদীস, ও কোরান)। সেই সঙ্গে তিনি এও বোলেছেন যে বা যারা শেরক কোরবে অর্থাৎ আমার সর্বব্যাপী তওহীদের কোথাও অন্যকে এতটুকু স্থান দেবে তাকে বা তাদেরকে আমি ক্ষমা কোরবো না, তাদের জাহান্নামে স্থান দেবো। তারা যত ভালো আমলই করুক আমি তা গ্রহণ কোরবো না (কোরান- সুরা যুমার, আয়াত ৬৪- ৬৬)।

আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহর এই চরমপন্থী মনোভাব কেন? কারণ আছে। মানুষ সমষ্টিগত জীবনে যে সংবিধান, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, নিয়ম- পদ্ধতি স্বীকার কোরে তা মেনে চলে তার প্রভাব অতি শক্তিশালী, তা ব্যক্তি জীবনের কাজকর্মকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিগত জীবন- পদ্ধতি যদি সমষ্টিগত জীবন- ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন হয় তবে সমষ্টিগত জীবনের বৃহত্তর প্রভাবে ও চাপে ব্যক্তিগত জীবন- পদ্ধতি ক্রমে দুর্বল হোতে হোতে বিলীন হোয়ে যাবে। আর যদি ব্যক্তিগত জীবন- পদ্ধতি সমষ্টিগত জীবন- ব্যবস্থার বিপরীত হয় তবে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হবে এবং সে সংঘর্ষে ব্যক্তিগত জীবন- পদ্ধতি অবশ্যই পরাজিত হবে। জোনাকী পোকার নিজের দেহের আলোকে তার ব্যক্তিগত কিছুটা কাজ হোতে পারে কিন্তু তা রাতের অন্ধকার দূর কোরতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ হোল, যদি মানবজাতিকে একটি অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, অশান্তিহীন জীবন যাপন কোরতে হয়, অর্থাৎ যে জীবনে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা নেই তবে তাকে অবশ্যই

এমন একটি সংবিধান ও ঐ সংবিধান নিঃসৃত আইন- কানুন, দণ্ডবিধি প্রণয়ন কোরতে হবে যা নিখুঁত ও নির্ভুল। মানবজাতির পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ তার জ্ঞানের পরিধি ছোট, সীমিত। আইন- কানুন ও দণ্ডবিধির ভিত্তি হোচ্ছে মানুষের মনস্তত্ব। বর্ত্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিদ, মনোবিজ্ঞানীরা বোলছেন- আমরা মানুষের বিশাল মনস্তত্বের শুধু দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই মানুষের পক্ষে ঐ রকম একটি নির্ভুল ও নিখুঁত সংবিধান, জীবন- ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ মানুষকে বোলেছেন- আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও, আমিই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা, তোমাদের দেহ ও মনেরও স্রষ্টা, তাই আমি জানি কেমন সংবিধান, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি মেনে চোললে তোমরা ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমাহীন সমাজে বাস কোরতে পারবে, শান্তিতে (এসলামে) বাস কোরতে পারবে। আর যদি আমারই দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার কোরে আমার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার কোরে নিজেরা সার্বভৌম হোয়ে সংবিধান, আইন- কানুন ও দণ্ডবিধি, অর্থনীতি তৈরী কোরে তাই মেনে চলো তবে এবলিস যে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় তোমাদের ফেলবে বোলেছিলো তোমরা তাতেই পতিত হবে, তাহোলে সে আমাকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো তাতে সে জয়ী হবে, আমি পরাজিত হবো। আমি সর্বশক্তিমান, আমি ইচ্ছা কোরলেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এই মুহুর্ত্তেই আমার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নেবে (কোরান- সুরা আনআম, আয়াত ৩৫, সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯)। কিন্তু আমি তা কোরবো না, আমি দেখতে চাই আমার দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার কোরে তোমরা কী করো। সার্বিক জীবনে আমার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে **তোমরা যত সওয়াবের কাজই কর, যত এবাদতই কর, যত তাকওয়াই কর সমস্ত আমি ধুলা- ময়লার মত ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলে দেবো** (কোরান- সুরা ফোরকান, আয়াত ২৩)।

আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত হাজার হাজার (হয়ত লক্ষ লক্ষ) বছর ধরে মানুষের প্রতি জনপদে আল্লাহ তাঁর প্রেরিতদের, নবী- রসুলদের পাঠিয়ে আসছেন (কোরান- সুরা রা'দ, আয়াত ৭, সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুরা নহল, আয়াত ৩৬)। সময় ও স্থানভেদে আইন- কানুন তফাৎ হোয়েছে, কিন্তু মূল ভিত্তি সব সময় ঐ এক কথা- তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। **কারণ সার্বভৌমত্ব তাঁর না হোলে সংবিধানও তাঁর হবে না এবং সংবিধান নিঃসৃত আইন- কানুন, দণ্ডবিধিও তাঁর হবে না এবং তা না হোলেই তা হোতে হবে মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর এবং পরিণতি হবে সেই ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা।** আর আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নিলেই সংবিধান হবে তাঁর বাণী (পূর্বে অন্যান্য কেতাব, বর্ত্তমানে কোরান), আর তা থেকে নিঃসৃত আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, দীন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একের পর এক নবী ও রসুলদের আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তারা এসে ঐ একই বাণী প্রচার কোরেছেন, তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত- চিরন্তন, সনাতন ধর্ম। নবী রসুলরা চলে গেলে শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের উম্মাহ তাদের দীনকে বিকৃত কোরে ফেলেছে। তাদের মধ্যে একটা পুরোহিত শ্রেণী গজিয়েছে, যারা সারা জীবন ঐ দীন নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। শরিয়াহ'র বিধানগুলোকে নানাভাবে বিশ্লেষণ কোরে কোরে নতুন নতুন ফতোয়া বের কোরেছে ও তা জনসাধারণকে শিখিয়েছে। সহজ সরল পথ সেরাতুল মুস্তাকীমকে এক দুর্বোধ্য, জটিল বিষয়ে পরিণত কোরে জাতিকে মূল লক্ষ্য থেকেই বিচ্যুত কোরে ফেলেছে। তারা আল্লাহর কেতাবে যোগ- বিয়োগ কোরে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী আদেশ নির্দেশগুলিকে বদলিয়ে স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে এসেছে। কঠিন আদেশগুলি, যেগুলি পালন কোরতে গেলে ক্ষতি হয়, ত্যাগের, কোরবানীর প্রয়োজন হয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে সহজ কাজগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনি কোরে বিকৃতি যখন এমন পর্যায়ে চোলে গেছে যে, সে দীন পালন কোরলে উপকারের

চেয়ে অপকারই বেশী হোয়ে দাঁড়িয়েছে তখন সেটাকে শুধরিয়ে ভারসাম্যে ফিরিয়ে নেবার জন্য রহমানুর রহিম আল্লাহ আবার তাঁর নবী- রসুল পাঠিয়েছেন।

এইখানে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে, কারণ আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত, অর্থাৎ মানবজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা জড়িত। কথাটা হোচ্ছে এই : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে প্রতি জনপদে আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুলদের আসা, তাঁদের চলে যাবার পর দীনকে বিকৃত করা, সে বিকৃতি শোধরাতে আবার নবী- রসুলদের আসা- এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যে একটি বিষয় দৃঢ় ও অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে চোলে এসেছে। সেটা হোচ্ছে- **মানবজাতি তার জীবন- ব্যবস্থার আইন-কানুনের উৎস হিসাবে কখনই স্রষ্টাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করে নাই**, আল্লাহকে এলাহ হিসাবে কখনও অস্বীকার করে নাই। আল্লাহর দেয়া দীনকে, আইন- কানুন দণ্ডবিধিগুলিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য, অন্যকে শোষণ করার জন্য দুমড়িয়ে, মুচড়িয়ে বিকৃত কোরে ফেলেছে। কিন্তু **ঐ বিকৃত রূপরেখাকেও ধর্মের অনুশাসন বোলেই চালাতে হোয়েছে। সার্বভৌম হিসাবে আল্লাহকে অস্বীকার কোরে সার্বভৌমত্ব নিজেদের হাতে কখনই তুলে নেয়া হয় নি**, নেবার চেষ্টাও করা হয় নি। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা দরকার কারণ দাজ্জাল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন যে তাকে আল্লাহর শেষ রসুল মানবজাতির জন্ম থেকে শেষ পর্যন্তসম্পূর্ণ সময়টার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা বোলে বর্ণনা কোরেছেন। এই যে বোললাম যে মানুষ কখনই আল্লাহকে এলাহ হিসাবে অস্বীকার করে নাই- এ কথাটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ধর্মের অনুশাসন বোলে হুকুম চালালেও ক্রমশ বিকৃতি এমন পর্যায়ে চোলে গেছে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শুধু মুখে স্বীকৃতি দিলেও কার্য্যতঃ সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে চোলে গেছে। যেমন - ফেরাউন নিজেকে 'রা' অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসক বোলে প্রচার কোরলেও সে নিজেই সার্বভৌম হোয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ফেরাউনের এই সার্বভৌমত্ব ছিলো কার্য্যতঃ, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, সে তার সার্বভৌমত্ব সূর্য্য দেবতা 'রা'- এর নামে চালাতো। দ্বিতীয়তঃ তার ঐ সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) সীমিত ছিলো মিশরে, পৃথিবীময় নয়। **দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের এই সার্বভৌমত্ব কার্য্যতঃ ও আনুষ্ঠানিক উভয়ই এবং পৃথিবীময়, তাই এটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা।**

দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি: আল্লাহর নবী মুসার (আঃ) দীনকে পুরোহিত শ্রেণী, রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীরা যখন চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে ও নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার কোরে বিকৃত কোরে ফেললো, তখন সেটাকে শোধরাতে, ওটাকে নতুন জীবন দিতে আল্লাহ পাঠালেন তাঁর অন্য নবী ঈসাকে (আঃ)। ইহুদীদের ঐ আলেম শ্রেণী, রাব্বাই- সাদ্দুসাইরা আল্লাহর কেতাব তওরাত পড়াশোনা কোরেছেন সারা জীবন, তওরাতের আইন- কানুনের ওপর কঠোর গবেষণা কোরেছেন, তারা কখনোই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেন নাই, তাঁর কেতাব তওরাতকেও অস্বীকার করেন নাই। তওরাতের আইন- কানুনগুলিকে তারা অতিবিশ্লেষণ কোরে বিকৃত কোরে ফেলেছিলেন, কিন্তু ঐ বিকৃত আইনগুলিকে তাদেরকে তওরাতের আইন বোলেই চালাতে হোয়েছে। রাব্বাই- সাদ্দুসাইরা এ কথা বোলতে পারেন নি, বা বলেন নি যে তওরাতের আইন- কানুন অচল হোয়ে গেছে, তাই আমরা আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি এসব নতুন কোরে তৈরী কোরছি। এই উপমহাদেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসও তাই। মনু অর্থাৎ নুহের (আঃ) মাধ্যমে আল্লাহ যে শরিয়াহ অর্থাৎ আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি,

রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন পরবর্ত্তীতে তা পুরোহিত শ্রেণী তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য বিকৃত কোরে ফেললেও তা ঐ মনুসংহিতার নামেই অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া আইন বোলেই চালাতে হোয়েছে। ক্ষত্রিয় রাজারা দেশ জাতি শাসন কোরতেন কিন্তু আইন ও আইনের ব্যাখ্যা দিতেন পুরোহিতরা শাস্ত্র দেখে দেখে, রাজাদের সাধ্য ছিলো না তা অস্বীকার কোরে নিজেরা আইন তৈরী কোরে নেবার। তা কোরতে গেলে বা শাস্ত্র লংঘন কোরতে গেলে তৎক্ষণাৎ মাৎস্যন্যায় (বিদ্রোহ কোরে রাজাকে হত্যা) হোয়ে যেতো। এমনকি যাদের মধ্যে আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী আবির্ভূত হোলেন, যাদের আমরা মোশরেক ও কাফের বোলে জানি তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস কোরতো, তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা বোলে জানতো।

এ কথার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ দিচ্ছেন। তিনি তাঁর রসুলকে বোলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি কোরেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে সেই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী (আল্লাহ); (কোরান- সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯)। অন্যত্র বোলছেন- তুমি যদি তাদের প্রশ্ন কর- আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি কোরেছেন এবং কে সূর্য্য ও চাঁদকে তাদের (কর্ত্তব্য কাজে) নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণ কোরছেন? তবে তারা অবশ্যই বোলবে, আল্লাহ (কোরান- সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৬১)। আল্লাহ আবার বোলছেন- যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর- মাটি (পানির অভাবে শুকিয়ে যেয়ে) মরে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ কোরে কে তাকে আবার পুনর্জীবন দান করেন? তবে তারা অবশ্যই বোলবে- আল্লাহ (কোরান- সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৬৩)। তিনি আবার বোলছেন তাঁর রসুলকে- যদি তাদের প্রশ্ন করকে এই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কোরেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- আল্লাহ (কোরান- সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)। আল্লাহর শেষ রসুল যখন আরবের তথা পৃথিবীর মোশরেক ও কাফেরদের তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে ডাক দিয়েছিলেন তখন তারা বোলেছিলো- আমরা কি আল্লাহকে বিশ্বাস কোরি না? অবশ্যই বিশ্বাস কোরি, আমরা হুবাল, লাত, মান্নাতকে পূজা কোরি তো শুধু এই জন্য যে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ কোরবে (কোরান- সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)। আমরা কি কাবাকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরি না? অবশ্যই কোরি। আমরা কি আমাদের সন্তানদের নাম আব্দুলাহ রাখি না? আমরা প্রতি কাজ কি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু কোরি না? নিশ্চয়ই কোরি। তাহোলে তুমি আমাদের আবার কোন তওহীদ শেখাতে চাও? মোটকথা আদম (আঃ) থেকে নিয়ে মানবজাতি কখনই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার কোরে সার্বভৌমত্বকে নিজেদের হাতে তুলে নেয় নি। **কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে এটাই ছিলো এবলিসের ঘোষিত লক্ষ্য।** যখন সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো যে তোমার খলীফাকে আমি তোমার সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত কোরবো, তখন সে এ কথাই বুঝিয়েছিলো যে সে তাকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করাবে, তাঁর সর্বব্যাপী তওহীদকে অস্বীকার করাবে।

যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে নবী- রসুল পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ্, পথ- প্রদর্শনের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ বনি- এসরাঈলীদের মধ্যে পাঠালেন তাঁর নবী মুসাকে (আঃ)। যে কয়েকজন নবী আল্লাহর কাছ থেকে শরিয়াহ নিয়ে এসেছেন মুসা (আঃ) তাঁদের অন্যতম। শরিয়াহ হোল সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য নিয়ম- পদ্ধতি, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি। অর্থাৎ মানব জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শরিয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত। মুসা (আঃ) পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পর বনি- এসরাঈলীদের মধ্যে সেই সব বিকৃতি এসে গেলো যেগুলি পূর্ববর্ত্তী সব জাতির মধ্যে এসেছে। মুসার (আঃ) উম্মতের মধ্যে একটি

পুরোহিত শ্রেণী গজালো যারা শরিয়াহ'র আইন- কানুন গুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে কোরে নতুন নতুন ফতোয়া আবিষ্কার কোরে তা জনসাধারণের ওপর চাপাতে থাকলো। ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, দীনের আসল উদ্দেশ্যই তাদের সামনে থেকে লোপ পেয়ে পুংখানুপুংখভাবে শরিয়াহ পালনই তাদের মুখ্য লক্ষ্য হোয়ে দাঁড়ালো।

দীনের এই বিকৃতির শাস্তি হিসাবে আল্লাহ বনি এসরাঈল জাতিকে দেবদেবী পূজক ইউরোপীয় রোমানদের দাসে পরিণত কোরে দিয়েছিলেন, যেমন একই কারণে পরবর্ত্তীতে মোসলেম নামে পরিচিত জাতিটাকে ইউরোপের বিভিন্ন খৃষ্টান জাতিগুলির দাসে পরিণত কোরে দিয়েছেন। ঈসা (আঃ) যখন বনি- এসরাঈলীদের মধ্যে আবির্ভূত হোলেন তখন তারা দেব- দেবী পূজারী (Pagan) রোমানদের দাস। এই নতুন নবী ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গে কোন শরিয়াহ আনলেন না কারণ তাঁর পূর্ববর্ত্তী মুসার (আঃ) শরিয়াহ তখনও মোটামুটি অবিকৃত ছিলো। ঈসা (আঃ) বনি- এসরাঈল জাতিকে যা যা বোললেন তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় হোল:-
(ক) আমি মুসার শরিয়াহ (আইন- কানুন, Law of Moses) বাতিল কোরতে আসি নাই, বরং ওটাকে সত্যায়ন ও সমর্থন কোরতে এসেছি। এই কথা বোলে ঈসা (আঃ) বুঝাচ্ছেন যে তিনি মুসার (আঃ) শরিয়াহতে কোন হস্তক্ষেপ কোরতে আসেন নি, দীনের আত্মাকে বাদ দেওয়ায় ঐ শরিয়াহ প্রাণহীন হোয়ে গেছে, কাজেই সেই প্রাণকে অর্থাৎ ভারসাম্যকে আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি প্রেরিত হোয়েছেন।

(খ) শুধুমাত্র এসরাঈলের পথভ্রষ্ট মেষগুলি ছাড়া অন্য কারো জন্য আমাকে পাঠানো হয় নাই (বাইবেল- নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু ১৫:২৪)। এ কথা বোলে ঈসা (আঃ) তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের সীমার কথা পরিষ্কার কোরে দিলেন। পরে আরও পরিষ্কার কোরলেন যখন তিনি তাঁর প্রধান বারজন শিষ্যকে প্রচার কাজে চারিদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের তিনি নির্দেশ দিয়ে দিলেন তোমরা অন্য কোন জাতির মধ্যে যাবে না, স্যামারিয়ানদের কোন নগরীতে, শহরে প্রবেশ কোরবে না। তোমরা শুধুমাত্র এসরাঈলী সমাজের পথভ্রষ্ট মেষগুলির কাছে যেতে থাকবে (বাইবেল- নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু ১০:৬)।

আল্লাহর প্রত্যেক নবীকেই তাঁর পূর্ববর্ত্তী নবীর উম্মাহর পুরোহিত শ্রেণী প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছে, সর্বতোভাবে তাঁর বিরোধিতা কোরেছে। কোন নবীই এর ব্যতিক্রম নন। কারণ-

প্রথমতঃ পূর্ববর্ত্তী নবীর দীনের বিকৃত রূপটাকেই পুরোহিত শ্রেণী প্রকৃত দীন বোলে বিশ্বাস কোরতো। নতুন নবী যখন ঐ বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে কথা বোলেছেন তখন তারা মনে কোরেছে- ঐ লোক পথভ্রষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ দীন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের অহংকার। সারা জীবন ধর্ম বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে গবেষণা পড়াশোনা কোরে তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রচণ্ড অহংকার জন্ম নিয়েছে। পক্ষান্তরে নবী আবির্ভূত হোয়েছেন প্রায় প্রতিক্ষেত্রে নিরক্ষর হোয়ে, কিন্তু আল্লাহ থেকে সরাসরি জ্ঞানপ্রাপ্ত হোয়ে। কাজেই পুরোহিত শ্রেণী, আলেমরা ঐ নিরক্ষর মানুষের কথা মানতে রাজি হয় নি।

তৃতীয়তঃ ঐ পুরোহিত শ্রেণী আল্লাহর দেয়া কেতাবের বিকৃত ব্যাখ্যা কোরে কেতাবের আয়াত বিক্রী কোরে অর্থ উপার্জন করা হারামকে (কোরান- বাকারা ১৭৪, ইয়াসীন ২০- ২১) (নিষিদ্ধ) জায়েজ কোরে নিয়েছে তা নতুন নবী অবশ্যই বিরোধিতা কোরেছেন। পুরোহিত শ্রেণীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভবও ছিলো; কারণ তা মেনে নিলে তাদের অবৈধ রুজি- রোজগার বন্ধ হোয়ে যায়।

চতুর্থতঃ পুরোহিত শ্রেণী দেখেছে যে- এই লোককে স্বীকার কোরে নিলে সমাজের সম্মানিত প্রভাবশালী স্থান থেকে তাদের পতন, এক কথায় কায়েমী স্বার্থের অবসান। এইসব কারণে **এক নবীর উম্মাহর পুরোহিত শ্রেণী কখনও নতুন নবীকে স্বীকার কোরে নেয় নি।** সব সময় নতুন নবীকে স্বীকার কোরে নিয়েছে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে মানুষ। ঈসার (আঃ) ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হোল না। মুসার (আঃ) ধর্মেও পুরোহিত শ্রেণী রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফারিসীরা, অর্থাৎ আলেম শ্রেণী একযোগে উঠে পোড়ে লেগে গেলো নতুন নবী ঈসার (আঃ) প্রচণ্ড বিরোধিতায়। এই বিরোধিতায় তারা সাহায্য নিলো তাদের শাসক রোমানদের। রোমানরা প্রথমে ইহুদীদের ভেতর ধর্ম নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পোড়তে চায় নি, কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী ঈসাকে (আঃ) রোমানদের শাসনের ও প্রভুত্বের পক্ষে এক বিপজ্জনক শক্তি হিসেবে উপস্থাপিত কোরলো ও অনেক চেষ্টার পর তাদের বিশ্বাস করাতে সমর্থ হোলো। এরপর রোমানদের দিয়ে ঈসাকে (আঃ) মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যখন তা কার্য্যকরী করার জন্য তাঁকে ক্রুশে ওঠাবার বন্দোবস্ত কোরলো তখন আল্লাহ মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের দিয়ে সশরীরে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং ঈসার (আঃ) যে শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা কোরে তাঁকে আলেম ও রোমানদের হাতে ধোরিয়ে দিয়েছিলো তার দেহ ও চেহারা একদম ঈসার (আঃ) মত কোরে দিলেন, তারা ঈসা (আঃ) মনে কোরে তাকেই ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা কোরলো।

আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) মাত্র তিন বছর বনি-এসরাঈলীদের হেদায়াত করার সময় পেয়েছিলেন। এই তিন বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ৭২ জন, মতান্তরে ১২০ জন ইহুদী তাদের ভুল বুঝতে পেরে ঈসার (আঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরেছিলো। আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) আসমানে উঠিয়ে নেয়া ও ঈসার (আঃ) চেহারার জুডাস্ ইস্কারিয়াসকে ঈসা (আঃ) মনে কোরে ক্রুশে উঠিয়ে প্রাণদণ্ড দেয়ার পর ঈসার (আঃ) ঐ ৭২ বা ১২০ জন আসহাব প্রাণভয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে ও লুকিয়ে গেলেন, কেউ একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। যারা প্যালেস্টাইনে রোয়ে গেলেন তারা গোপনে ঈসার (আঃ) দেখানো পথে চোললেও প্রকাশ্যে নিজেদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীদের মতের সমর্থন দিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রোইলো না। এর কিছুদিন পর পল নামে একজন ইহুদী ঈসার (আঃ) ওপর ঈমান আনলেন। ইনি সত্যিই ঈসাকে (আঃ) বিশ্বাস কোরেছিলেন কিনা তা সন্দেহের বিষয় কারণ তার পরবর্ত্তী কাজকর্ম গভীরভাবে বিশ্লেষণ কোরলে মনে হয় যে, ঈসার (আঃ) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে তাদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত কোরে দেয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্য।

ঈসা (আঃ) খৃষ্টান ধর্ম বোলে নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্য আসেন নি, সে চেষ্টাও কখনও করেন নি। ইহুদীদের ধর্ম, অর্থাৎ মুসার (আঃ) মাধ্যমে প্রেরিত জুডাই (প্রকৃতপক্ষে সেই তওহীদ, এসলাম) ধর্ম পুরোহিতদের হস্তক্ষেপের ফলে ভারসাম্য হারিয়ে যে বিকৃতির মধ্যে পতিত হোয়েছিলো সেই বিকৃতি থেকে সেটাকে উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন ঈসা (আঃ)। ঠিক যেমন বুদ্ধ (আঃ) প্রেরিত হোয়েছিলেন তদানীন্তন বৈদিক, সনাতন ধর্মের বিকৃতিকে শোধরাবার জন্য। পল ঈসার (আঃ) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে যে কয়টি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কোরলেন তার মধ্যে সর্বপ্রধানটি হোচ্ছে ঈসার (আঃ) শিক্ষাকে বনি এসরাঈলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে বাইরে অ-ইহুদীদেও মধ্যে প্রচার করা ও তাদের ঈসার (আঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরতে আহ্বান করা। পল যখন ঈসার (আঃ) শিষ্যদের তাদের নবীর শিক্ষার বিরোধী এই প্রস্তাব দিলেন তখন তারা কেউ জেরুসালেমে ছিলেন না, ইহুদী আলেমদের ভয়ে তারা স্বদেশ থেকে গ্রীসে, এবং উত্তর-সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে নগরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুসংখ্যক শিষ্য-সাহাবা প্রাণ

বাঁচাতে এন্টিয়ক শহরে চলে গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ঈসার (আঃ) বারজন প্রধান শিষ্যদের অন্যতম বারনাবাসও ছিলেন। এদের কাছে পল যখন তার ঐ প্রস্তাব দিলেন তখন তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন কারণ এ প্রস্তাব তাদের শিক্ষক ঈসার (আঃ) শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষ কোরে বাধা দিলেন বিশিষ্ট সাহাবা বারনাবাস। কিন্তু সে বাধা সত্ত্বেও পল সাহাবাদের মত বদলাতে সমর্থ হোলেন। বোধহয় কারণ এই ছিলো যে ব্যর্থ, পরাজিত ও প্রাণভয়ে পলায়নকারী শিষ্যরা উপলব্ধি কোরলেন যে, বনি এসরাঈলীদের মধ্যে ঈসার (আঃ) শিক্ষা প্রচার অসম্ভব। যেখানে ঈসা (আঃ) নিজে ব্যর্থ হোয়ে গেছেন সেখানে শিষ্যরা হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তারা বুঝলেন ঈসার (আঃ) নীতি বিসর্জন দিয়ে বাইরে অ- ইহুদীদের মধ্যে প্রচার না কোরলে ঐ শ'খানেক শিষ্যের পর পৃথিবীতে ঈসার (আঃ) শিক্ষা লুপ্ত হোয়ে যাবে। একে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অ- ইহুদীদের মধ্যে প্রচার করা ছাড়া আর উপায় নেই। তারা বুঝলেন না বা বুঝলেও পাশ কাটিয়ে গেলেন যে ঈসা (আঃ) ও কাজ কোরতে নির্দিষ্টভাবে নিষেধ কোরে গেছেন কারণ জুডাই ধর্ম ও তার সংস্কার দু'টোই শুধুমাত্র বনি- এসরাঈলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওর বাইরে ওটা সম্পূর্ণ অচল।

আমাদের বিশেষ কোরে মনে রাখতে হবে যে **ইহুদীদের ধর্ম অর্থাৎ জুডাই ধর্ম গোত্রিয় ধর্ম, শুধুমাত্র বনি- এসরাঈলীদের জন্য।** ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন সীমিত দায়িত্ব দিয়ে, শুধু পথভ্রষ্ট বনি- এসরাঈলীদের হেদায়াত কোরতে। ঈসা (আঃ) নিজে ছিলেন মুসার (আঃ) ধর্মের অনুসারী, তাঁর প্রত্যেক শিষ্যও ছিলেন ইহুদী, বনি- এসরাঈল। মতভেদ শুধু ছিলো রাব্বাই, সাদ্দুসাই ও ফারিসীদের অর্থাৎ আলেম শ্রেণীর সাথে, আদর্শগত, আকীদাগত। পল ঈসার (আঃ) ঘোর বিরোধী ও তাঁকে নির্যাতনকারীদের প্রথম সারির একজন ছিলেন এটা বড় কথা নয়, কারণ পৃথিবীতে বহু উদাহরণ আছে যেখানে ঘোর বিরোধী নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরে অকৃত্রিম, দৃঢ় সমর্থক হোয়ে গেছেন। ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ), খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ), একরামা বিন আবু জাহেল (রাঃ) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বড় কথা হোল এই যে, পল ঈসার (আঃ) সঙ্গে থেকে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাহচর্য্য পান নি। কাজেই ঈসার (আঃ) প্রকৃত শিক্ষা ও তার মর্ম তিনি পান নি, অথচ ঈসা (আঃ) পৃথিবী থেকে চোলে যাবার বেশ পরে, যারা সর্বক্ষণ ঈসার (আঃ) সাহচর্য্যে থেকে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা পেয়েছিলেন তাদের চেয়ে বড় প্রবক্তায় পরিণত হোয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি যে শিক্ষা প্রচার আরম্ভ কোরলেন তা ঈসার (আঃ) শিক্ষা থেকে শুধু বহু দুরে নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। যা হোক, পলের দলের ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও প্রচারের ফলে অ- ইহুদীদের মধ্য থেকে অনেক লোক ঈসার (আঃ) ওপর বিশ্বাস এনে পলের নেতৃত্বে তার শিষ্যদের উপদেশ মতে চোলতে চেষ্টা আরম্ভ কোরলো। তখন কিন্তু আর ঈসার (আঃ) শিক্ষা অবিকৃত নেই। পল তার সুবিধা ও ইচ্ছামত ঈসার (আঃ) শিক্ষাকে যোগ- বিয়োগ কোরে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছেন যে সেটা আর তখন ইহুদীদের অর্থাৎ মুসার (আঃ) ধর্মও নয়, কিম্বা মুসার (আঃ) ধর্মের বিকৃতি শুধরিয়ে সেটাকে ঈসা (আঃ) যে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কোরেছিলেন সেটাও নয়, **পলের হাতে পোড়ে সেটা এক নতুন ধর্মের রূপ নিয়েছে।** বর্ত্তমানে খৃষ্টান ধর্মের অনেক পণ্ডিতরাই বোলছেন যে আমরা আজ যে খৃষ্টধর্ম দেখি এটাকে খৃষ্টধর্ম (Christianity) না বোলে পলিয় ধর্ম (Paulinity) বলা উচিত। যা হোক ঐসব কারণে ঈসার (আঃ) শিক্ষার ঐ বিকৃত রূপটাকে একটা নতুন নাম দেয়া দরকার হোয়ে পড়লো। **মুসার (আঃ) ধর্ম অর্থাৎ জুডাই (ইহুদী) ধর্মের গলদ ও বিকৃতি সংস্কার কোরে সেটাকেই আবার পুনর্জীবন দেবার চেষ্টাকে মূল ইহুদী ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে- একটি নতুন ধর্মই সৃষ্টি করা**

হোল এবং এই নতুন ধর্মের নাম দেয়া হোল খৃষ্টধর্ম। পল কর্তৃক এই যে নতুন নামে নতুন একটি ধর্ম চালু করা হোল এটা কিন্তু ঈসার (আঃ) দেশে হোল না, কারণ ইহুদী পুরোহিতরা ঈসা (আঃ) ও তাঁর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান কোরেছে ও তাঁর অনুসারীদের দেশ থেকে বহিষ্কার কোরে দিয়েছে। প্যালেস্টাইনে তখন ঈসার (আঃ) কোন অনুসারী নেই, থাকলেও গোপনে, ব্যক্তিগতভাবে। সুতরাং **এই নতুন ধর্মের পত্তন করা হোল জেরুসালেম নয়, প্যালেস্টাইনে নয়, বাইরে এন্টিয়ক (Ant i och) নগরে (**বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট, এক্ট ১১:২৬) । আরও পরিহাসের ব্যাপার হোল এই যে, যে ঈসার (আঃ) নামে এই ধর্মের সূত্রপাত করা হোল সেই ঈসা (আঃ) তাঁর জীবনেও 'খৃষ্টধর্ম' বোলে কোন ধর্মের নামই শোনেন নি।

পল ও তার অনুসারীরা যখন এই নতুন ধর্ম ইউরোপে প্রচার আরম্ভ কোরলেন তখন ইউরোপীয়ানরা নানা রকম দেব- দেবীর, ভূত- পেত্নীর পূজা কোরতো। ভূমধ্যসাগরের অপর পারেই ছিলো একেশ্বরবাদী জুডাই ধর্ম, অর্থাৎ মুসার (আঃ) মাধ্যমে প্রেরিত জীবন- বিধান। কিন্তু তা তারা গ্রহণ করে নি, কারণ ওটা সীমিত ছিলো শুধু বনি- এসরাঈলীদের মধ্যে; ইহুদীরাই তাদের ধর্মকে বাইরের কাউকে গ্রহণ কোরতে দিতোনা- তারা জানতো যে ও ধর্ম শুধু তাদের গোত্রিয় ধর্ম। যে জন্য ঈসা (আঃ) তা নিজেও অ- ইহুদীদের মধ্যে প্রচার করেন নি, তাঁর শিষ্যদেরও তা কোরতে নিষেধ কোরে দিয়েছিলেন। এখন পল যখন ঐ ধর্মের একটা বিকৃত রূপ ইউরোপীয়ানদের সামনে উপস্থাপিত কোরে তা গ্রহণ কোরতে বোললেন তখন তারা দেখলো যে ঐ বিকৃত রূপটাও তাদের দেব- দেবী, ভূত- পেত্নী পূজার চেয়ে অনেক ভালো, অনেক উন্নত। এছাড়াও অন্যান্য কারণে **পলের এই 'ধর্ম' সম্পূর্ণ ইউরোপে গৃহীত হোল।** ইউরোপে এই ধর্ম সার্বিকভাবে গৃহীত হবার পর এক বুনিয়াদী সমস্যা দেখা দিলো। মুসা (আঃ) ছিলেন বনি এসরাঈলীদের জন্য জীবন- বিধান অর্থাৎ দীনের বাহক, যে দীন শরিয়াহ অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনের রাজনৈতিক, আর্থ- সামাজিক, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত জীবনের আত্মশুদ্ধির- প্রক্রিয়ার ভারসাম্যযুক্ত (ওয়াসাতা) ব্যবস্থা। ঐ দীনের আত্মার দিকটাকে পরিত্যাগ কোরে ওটার শরিয়াতের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে সেটাকেই পালন করার আতিশয্যকেই ধর্ম পালন মনে করার বিরুদ্ধে প্রেরিত হোলেন ঈসা (আঃ)। তিনি বোললেন- আমি মুসার (আঃ) শরিয়াহ (Law of Moses) বাতিল কোরতে প্রেরিত হই নি, বরং সেটাকে সত্যায়ন, স্বীকৃতি দিতে এসেছি। কিন্তু তোমরা যে আত্মার দিকটাকে পরিত্যাগ কোরেছো সেটাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোরতে এসেছি। **সুতরাং ঈসার (আঃ) শিক্ষার মধ্যে বিন্দুমাত্র জাতীয় শরিয়াহ নেই, আছে শুধু ব্যক্তিগতভাবে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া।** পল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রচারে ইউরোপ এই একতরফা, ভারসাম্যহীন ধর্ম গ্রহণ কোরলো ও তা তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোরলো। কারণ পেছনে বোলে এসেছি যে, মানুষ কখনই সার্বভৌমত্ব নিজের হাতে নিয়ে আইন- কানুন তৈরী কোরে- সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন যাপনের চেষ্টা করে নি। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কোরে ইউরোপ **খৃষ্টধর্মমতেই সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা কোরলো।** রোমে আসীন পোপ সমগ্র ইউরোপের জীবন- ব্যবস্থার পথ নির্দেশ দিতে আরম্ভ কোরলেন।

আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতিহীন একটি ব্যবস্থা দিয়ে একটি সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা অসম্ভব এটা সাধারণ জ্ঞান। অথচ পোপ ও ইউরোপীয় রাজারা সেই ব্যর্থ চেষ্টাই কোরলেন কারণ ধর্মীয় আদেশ- নিষেধ বাদ দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান কোরে নিজেরা সার্বভৌম হোয়ে নতুন সংবিধান, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি প্রণয়ন

কোরে নেয়া তখনও মানুষের কাছে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ছিলো। এই চেষ্টা কোরতে যেয়ে প্রতিপদে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারে সংঘাত আরম্ভ হোল এবং ক্রমশ তা এক প্রকট সমস্যারূপে দেখা দিলো। এই সংঘাতের দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিবরণে না যেয়ে শুধু এটুকু বোললেই চোলবে যে এই সংঘাত এক সময়ে এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছালো যে ইউরোপীয় রাজা ও সমাজ নেতাদের সামনে দু'টো পথ খোলা রোইলো- **হয় এই ধর্ম বা জীবন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরতে হবে, আর নইলে এটাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে, যেখান থেকে এটা রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন প্রভাব বিস্তার না কোরতে পারে।** যেহেতু ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিদায় দেয়া অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজ নেতারা দ্বিতীয় পথটাকে গ্রহণ কোরলেন এবং **অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজ অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হোল, দাজ্জালের জন্ম হোল।** ইংল্যান্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খৃষ্টান জগৎ এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগে বাধ্য হোল। এর পর থেকে খৃষ্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, এক কথায় জাতীয় জীবনে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার আর কোন কর্তৃত্ব রোইলো না। এর পর ইউরোপীয় খৃষ্টানরা ক্রমেই বস্তুবাদী (Materialistic) হোয়ে পোড়তে শুরু কোরলো। এটা একটা পরিহাস (Irony) যে, যে জাতির সকল লোক এমন একটি ধর্ম গ্রহণ কোরলো যে ধর্মের মূলমন্ত্রই হোচ্ছে আত্মশুদ্ধি, কেউ এক গালে চড় দিলে তাকে অন্য গাল পেতে দাও, জোর কোরে গায়ের কোট খুলে নিলে তাকে আলখেল্লাটাও দিয়ে দাও, সেই জাতি একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দেবে। কিন্তু তাই হোল কারণ পেছনে যেমন বোলে এসেছি, সমষ্টিগতভাবে মানুষ যেটা গ্রহণ ও প্রয়োগ করে সেটার প্রভাবই প্রবল ও শক্তিশালী হোয়ে দাঁড়ায়, ব্যক্তি সেখানে গৌণ ও দুর্বল হোয়ে যায়। খৃষ্টধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসিত কোরে আশা করা যেতো যে জাতীয় জীবনে ধর্মের মূল্যবোধ বিসর্জন দিলেও ব্যক্তি জীবনে ধর্মের প্রভাবে মানুষ পাপ ও অপরাধহীন হবে- কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাও হোলো না, যে কোন পরিসংখ্যান বোলে দেবে যে পাশ্চাত্যে, খুন, জখম, ডাকাতি, হাইজ্যাক, বোমাবাজি, ধর্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি প্রতিদিন ধাই ধাই কোরে বাড়ছে। কারণ সমষ্টিগত বৃহত্তর জীবনের চাপে ব্যক্তি তার নিজস্ব চরিত্র বেশী দিন ধোরে রাখতে পারে না। বিশেষ কোরে যদি জাতীয় জীবনের আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি মানুষের তৈরী করা অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ হয়। সমষ্টিগত জীবনে এই বস্তুবাদ নিয়ে ইউরোপীয় খৃষ্টানরা গত ৪৭৪ বছরে ক্রমে ক্রমে যান্ত্রিক প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান চর্চা কোরে প্রচণ্ড শক্তিশালী হোয়ে উঠলো ও বর্ত্তমানে এই শক্তিবলে সমস্ত পৃথিবীর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ কোরছে। **দাজ্জাল এখন পূর্ণবয়স্ক, যুবক।**

দাজ্জালের অর্থাৎ জুডিও খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতার আবির্ভাব মানুষ সৃষ্টির সময় থেকে পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা, নুহের (আঃ) সময়ের মহাপ্লাবনে মানবজাতি ধ্বংস হোয়ে যাবার চেয়েও বড় ঘটনা এই জন্য যে, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ, তাঁর খলীফা সৃষ্টি কোরেছিলেন- অর্থাৎ পরীক্ষা কোরে দেখা যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট এই সৃষ্টিটি তার স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে সম্মান কোরে স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান, দীন মোতাবেক জীবন যাপন করে, নাকি সে তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অপব্যবহার কোরে স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান কোরে নিজের জীবন-বিধান নিজেই তৈরী কোরে সেই মোতাবেক তার সমষ্টিগত জীবন যাপন করে। আদম (আঃ) থেকে শুরু কোরে চিরদিন স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে চলার পর ইহুদীদের

জুডাই ধর্মের সংস্কারের ঈসার (আঃ) প্রচেষ্টার বিকৃত রূপটাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগের ব্যর্থতার ফলে যখন ঐ দীনকে সমষ্টিগত জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হোল তখন মানবের সমষ্টিগত জীবনে প্রথমবারের মত স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হোল। **এই প্রথম এবলিস মানুষকে, বনি- আদমকে তওহীদ থেকে, সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে** (যে সেরাতুল মুস্তাকীমের ওপর ওঁৎ পেতে বসে থেকে সে আল্লাহর খলীফা বনি আদমের ওপর আক্রমণ চালাবে বোলে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো; (কোরান- সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৬, ১৭)) **দীনুল কাইয়্যেমা অর্থাৎ সনাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত কোরতে সমর্থ হোল।** এটা আদম, আল্লাহর খলীফা, প্রতিনিধি সৃষ্টি করার মৌলিক প্রশ্ন, আল্লাহকে দেয়া এবলিসের চ্যালেঞ্জের মৌলিক প্রশ্ন, এই চ্যালেঞ্জে এটাই এবলিসের প্রথম বিজয় তাই দাজ্জালের জন্ম ও আবির্ভাব আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

দুই ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **নুহ (আঃ) থেকে শুরু কোরে আল্লাহর এমন কোন নবী হন নি যিনি তাঁর উম্মাহকে, অনুসারীদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক কোরে যান নি। আমিও তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান কোরছি।** [আবু ওবায়দা বিন যাররাহ (রাঃ) থেকে তিরমিযি, আবু দাউদ]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে এই যে, দাজ্জালের আবির্ভাব মানবজাতির জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ঘটনা হবার কথায় মহানবী বোললেন, **আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত**, কিন্তু সতর্কবাণী দেবার কথায় বোললেন, আদমের (আঃ) বহু পরে **নুহ (আঃ) থেকে তাঁর পরবর্ত্তী নবীদের** ও তাঁদের উম্মাহদের। অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে নুহের (আঃ) আগে পর্যন্ত যে সব নবী- রসুল (আঃ) এসেছেন তারা তাঁদের উম্মাহদের দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন নি। ধরে নেয়া যায় যে, প্রয়োজন ছিলো না, নইলে তারা অবশ্যই তা কোরতেন। প্রশ্ন হোচ্ছে নুহের (আঃ) আগে পর্যন্ত দাজ্জাল সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করার প্রয়োজন কেন ছিলো না এবং নুহের (আঃ) সময় থেকে সেটার প্রয়োজন কেন আরম্ভ হোল?

এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহই জানেন, তবে আমি যা বুঝি তা হোচ্ছে এই যে, মানবজাতির ইতিহাসকে দুইটি প্রধান ভাগে বা পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি আদম (আঃ) থেকে নুহের (আঃ) ঠিক আগে পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি নুহ (আঃ) থেকে শুরু কোরে আজও চোলছে। নুহের (আঃ) সময়ে মহাপ্লাবন হোয়ে মানুষসহ সমস্ত পৃথিবীর প্রাণী ধ্বংস হোয়ে যেয়ে নুহ (আঃ) থেকে মানবজাতি আবার আরম্ভ হওয়ায় নুহের (আঃ) এক নাম আদমে সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় আদম। নুহ (আঃ) থেকে বনি আদমের, মানুষ জাতির জীবনের, ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়, পর্ব আরম্ভ হোল। কোরানে আমরা আদমের (আঃ) পর থেকে নুহ (আঃ) পর্যন্ত কোন নবী- রসুলের নাম পাই না। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, ঐ সময়ের মধ্যে কোন নবী রসুল আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠান নি; অবশ্যই তিনি পাঠিয়েছেন এবং বহু সংখ্যায় পাঠিয়েছেন। কারণ এক লাখ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী- রসুলের মধ্যে কোরানে আমরা নাম পাই মাত্র জনাত্রিশেক।

বাকিরা কোথায়? কবে এসেছেন? কোরানে আল্লাহও বোলেছেন- **আমি পৃথিবীর প্রতি জনপদে, লোকালয়ে আমার নবী পাঠিয়েছি** (কোরান- সুরা ইউনুস, আয়াত ৪৭, সুরা নহ্‌ল, আয়াত ৩৬, সুরা রা'দ, আয়াত ৭)। এও বোলেছেন- তাদের (পূর্ববর্ত্তী নবীরসুলদের) **কতকের সম্বন্ধে তোমাকে [মোহাম্মদকে (দঃ)] জানালাম, কতকের সম্বন্ধে জানালাম না** (কোরান- সুরা মো'মেন, আয়াত ৭৮)। এই যে মাত্র ত্রিশ জনের মত নবী-রসুলদের নাম আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে আমাদের জানালেন, তারা সবাই নুহের (আঃ) পর, তাঁর আগের নয়। তার মানে নুহের (আঃ) আগে মানবজাতির মধ্যে বিরাট সংখ্যার নবী-রসুল প্রেরিত হোয়েছেন যাদের নাম এবং কে পৃথিবীর কোথায়, কোন্ জাতি, কোন্ জনপদে প্রেরিত হোয়েছেন তা আমাদের জানা নেই।

হিন্দু শাস্ত্রে (প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বোলে কোন ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বোলে কোন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। শব্দটি এশিয়া মাইনর, খুব সম্ভব তুর্কী দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোরানে যেটাকে বলা হোয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ তওহীদ (কোরান- সুরা রূম, আয়াত ৪৩, সুরা বাইয়্যেনা, আয়াত ৫))। মানবজাতির জীবনের আয়ুষ্কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা হোয়েছে এবং ভাগগুলিকে এক একটি যুগ বলা হোয়েছে। প্রথম যুগের নাম সত্য যুগ, দ্বিতীয় যুগের নাম ত্রেতা যুগ, তৃতীয় যুগের নাম দ্বাপর যুগ ও চতুর্থ যুগের নাম কলি যুগ এবং তার পরই অর্থাৎ কলি যুগ শেষ হোলেই মহাপ্রলয় অর্থাৎ কেয়ামত হোয়ে মানুষ, পৃথিবী সবই শেষ হোয়ে যাবে। ঐ ধর্মমতে সত্যযুগে সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ হোলে শতকরা একশ' বারই সত্য জয়ী হতো, মিথ্যা পরাজিত হতো; ত্রেতা যুগে সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ হোলে শতকরা পঞ্চাশবার সত্য জয়ী এবং শতকরা পঞ্চাশবার মিথ্যা জয়ী হতো, দ্বাপর যুগে ঐ রকম সংঘর্ষ হোলে মিথ্যা শতকরা পঁচাত্তর বার জয়ী, সত্য পঁচিশবার জয়ী ও শেষ কলিযুগে সত্য- মিথ্যার সংঘর্ষে মিথ্যা শতকরা একশ' বারই জয়ী ও সত্য একশ' বারই পরাজিত হবে। এটা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে, হিন্দু ধর্মের আবাসভূমি এই ভারত উপমহাদেশ থেকে বহু দুরে গ্রীক ও রোমানদের প্রাচীন ধর্মেও মানবজাতির আয়ুষ্কালকে চার ভাগে ভাগ করা হোয়েছে। প্রথমটি স্বর্ণ যুগ, দ্বিতীয়টি রৌপ্য যুগ, তৃতীয়টি তাম্র যুগ ও শেষটি লৌহ যুগ। **মোটামুটি হিন্দু ধর্মের বিভাগের অনুরূপ।** এসলাম ধর্মে ঠিক অমন পরিষ্কার যুগ বিভাগ না থাকলেও বর্ত্তমান সময় যে শেষ যুগ অর্থাৎ আখেরী যমানা তা সর্বত্র গৃহীত এবং মহানবীর বিভিন্ন হাদীস দিয়ে সমর্থিত। সনাতন ধর্মমতে সত্য যুগে মানুষের আয়ু ছিলো এক লক্ষ বছর, ত্রেতা যুগে দশ হাজার বছর, দ্বাপরে দুই হাজার এবং কলি যুগে অর্থাৎ বর্ত্তমানে একশ' বিশ বছর। মনে হয় এটা গড়পড়তা আয়ু ছিলো না, ঊর্দ্ধতম আয়ু ছিলো কারণ বর্ত্তমান কলি যুগে মানুষ ঊর্দ্ধতম একশ' বিশ বছরের মত বাঁচে দেখা যাচ্ছে।

যা হোক, এখন প্রশ্ন হোচ্ছে নুহ (আঃ) কোন্ যুগের নবী ছিলেন? কতকগুলি কারণ থেকে আমার মনে হয় তিনি দ্বাপর যুগে জন্মেছিলেন। কোরানে আল্লাহ বোলেছেন- নুহ নয়শ' পঞ্চাশ বছর তাঁর জাতির মধ্যে ছিলেন (কোরান- সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ১৪)। আল্লাহ এখানে শব্দ ব্যবহার কোরেছেন **'নাকেশ'** অর্থাৎ তাঁর জাতির মধ্যে ছিলেন। এখানে স্পষ্ট নয় যে নুহ (আঃ) তাঁর জাতির মধ্যে মোট সাড়ে নয়শ' বছর ছিলেন, নাকি নবুয়াত পাবার পর সাড়ে নয়শ' বছর তাঁর জাতির মধ্যে তওহীদ প্রচার কোরে ব্যর্থ হোয়েছিলেন। যদি ধোরে নেই যে, তিনি তওহীদ প্রচার কোরেছেন সাড়ে নয়শ' বছর তবে অন্তত আরও চার পাঁচশ' বছর ওর সাথে যোগ

কোরতে হবে, কারণ অবশ্যই তিনি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়াত পান নি, একটা পরিণত বয়সে পেয়েছেন; অর্থাৎ এই দাঁড়ায় যে, মহাপ্লাবনের সময় তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দশ' বা পনেরশ' বছর। তারপর মহাপ্লাবনের পর তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের মাঝেও তিনি বেশ কিছুকাল বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ মোট দু'হাজার বছরের কাছাকাছি। আর যদি ধরে নেই যে, তিনি তাঁর জাতির মধ্যে মোট সাড়ে নয়শ' বছর ছিলেন এবং তারপর মহাপ্লাবন হোল, তাহোলেও তিনি প্লাবনোত্তর যে সময়টা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কাটালেন সেটা যদি তিন, চার বা পাঁচশ' বছর হোয়ে থাকে তা হোলেও সেই দু'হাজার বছরের কাছাকাছিই যাচ্ছে। দ্বাপর যুগের মানুষের ঊর্দ্ধতম আয়ু ছিলো দেড় দু'হাজার বছর। তাই আমি নুহকে (আঃ) দ্বাপর যুগের নবী মনে কোরি।

এবার আসা যাক দাজ্জালের আবির্ভাবের ও সে সম্বন্ধে সতর্কীকরণের কাজ নুহ (আঃ) থেকে আরম্ভ হবার কারণে। এর কারণ হোল সত্য ও ত্রেতা যুগে দাজ্জালের জন্মের সম্ভাবনাই ছিলো না। কারণ সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধে সত্য যুগে শতকরা একশ' বার ও ত্রেতা যুগে শতকরা পঞ্চাশ বারই সত্যের যেখানে জয় হতো সেখানে দাজ্জালের জন্মের সম্ভাবনা (Potentiality) ছিলো না। কারণ মূলতঃ দাজ্জাল হোচ্ছে চাকচিক্যময় প্রতারক যাকে আল্লাহর রসুল কায্যাব অর্থাৎ মিথ্যা, মিথ্যাবাদী বোলে আমাদের সঙ্গে পরিচয় কোরিয়ে দিয়েছেন। দ্বাপর যুগে অর্থাৎ নুহের (আঃ) সময় থেকে আরম্ভ হোল দাজ্জালের মত একটি মিথ্যার আবির্ভাবের সম্ভাবনা, কারণ এই যুগে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে জয় পরাজয়ের অনুপাত হোয়ে দাঁড়ালো শতকরা পঁচাত্তর বার মিথ্যার জয়। তাই নুহ (আঃ) থেকেই আরম্ভ হোল প্রত্যেক নবীর দাজ্জালের আবির্ভাব সম্বন্ধে সতর্কবাণী, যদিও প্রকৃতপক্ষে দাজ্জালের জন্ম হবে ঘোর কলিযুগে, বর্ত্তমানে, তবুও যেহেতু শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মিথ্যার জয়ের সময় আরম্ভ হোল দ্বাপর যুগ থেকে, কাজেই তখন থেকেই নবী রসুলদের সতর্কবাণীও শুরু হোল।

বিশ্বনবীর যেসব হাদীসে আমরা দাজ্জালের বন্দী হোয়ে থাকার ও যথাসময়ে প্রকাশ হবার কথা পাই সেগুলির প্রকৃত অর্থ এটাই; তখনকার দিনের মানুষকে রূপক অর্থে বলা। কোন অজানা দ্বীপে দাজ্জাল শৃংখলিত হোয়ে থাকাটা তার ঐ সম্ভাবনার (Potentiality) কথাই রূপকভাবে বর্ণিত। আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ মানবজাতির সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোলেও দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধানবাণী আদমের (আঃ) অনেক পরে নুহ (আঃ) থেকে আরম্ভ কেন হোল তার কারণ এই। অর্থাৎ নুহের (আঃ) আগে সত্য ও ত্রেতা যুগে দাজ্জালের মত এতবড় মিথ্যার প্রকাশ ও তার পৃথিবীকে পদানত করার কোন সম্ভাবনা (Potentiality) ছিলো না।

এখানে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত ইবনে সাইয়াদ (রাঃ) সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন, কারণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে না পেরে একে অনর্থক অতি গুরুত্ব দেয়া হোয়েছে, এমনকি মেশকাতে একটি পুরো অধ্যায়ই ইবনে সাইয়াদের ওপর দেয়া হোয়েছে, অথচ এটা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়।

ব্যাপারটা এই: বিশ্বনবীর সময় মদীনায় এক ইহুদী পরিবারে এক শিশু জন্ম নেয়। শিশুটি বোধহয় কিছুটা অস্বাভাবিক ছিলো, কারণ এ খবর মহানবীর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে দেখতে যান। কিন্তু একে সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল বোলে আল্লাহর রসুল অবশ্যই মনে করেন নি। যেখানে তিনি জানেন যে, প্রকৃত দাজ্জাল তাঁর বহু পরে মাহ্দী (আঃ) ও ঈসার (আঃ) সময় আবির্ভূত হবে এবং ঈসার (আঃ) হাতে ধ্বংস হবে সেখানে তিনি তাঁর নিজের পবিত্র উপস্থিতির সময় মদীনায় কাউকে সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল বোলে মনে কোরবেন কেমন কোরে? তাছাড়া তিনি তো নিজেই

বোলেছেন যে দাজ্জাল মক্কায় এবং মদীনায় প্রবেশ কোরতে পারবে না (হাদীস- বোখারী এবং মোসলেম) অথচ ইবনে সাইয়াদ (রাঃ) জন্মেছেনই মদীনায় এবং মক্কাতেও গেছেন হজ্ব কোরতে। তাছাড়া ইবনে সাইয়াদ (রাঃ) মোসলেম হোয়েছিলেন এবং তার দাজ্জাল হওয়ার সম্বন্ধে নিজেই বোলেছেন- আল্লাহর রসুল কি বলেন নি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না, অথচ আমার সন্তান আছে; তিনি কি বলেন নি যে, দাজ্জাল কাফের হবে আর আমি মোসলেম (হাদীস- আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে মোসলেম)। মোট কথা মদীনার আবু সাইয়াদ (রাঃ) দাজ্জাল ছিলেন না এবং তার দাজ্জাল হবার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। যে ঈসার (আঃ) হাতে মৃত্যুর কথা বিশ্বনবী ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন, সেই ঈসার (আঃ) বহু পূর্বেই ইবনে সাইয়াদের (রাঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু হোয়েছে। কখনো কখনো আল্লাহর রসুল নবুয়াতের মিথ্যা দাবিদার ও অত্যাচারী শাসকদের দাজ্জাল বোলে অভিহিত কোরেছেন, কিন্তু তা আখেরী যমানার সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল নয় যার সম্বন্ধে নবী রসুলরা মানবজাতিকে সতর্ক ও সাবধান কোরে এসেছেন। অথচ বুঝতে না পেরে ইবনে সাইয়াদকে (রাঃ) সেই প্রকৃত দাজ্জাল বোলে চিহ্নিত করার চেষ্টায় হাদীসে একটি পুরো অধ্যায়ই যোগ করা হোয়েছে। **আমি এর কোন গুরুত্ব দেই না, কারণ প্রকৃত দাজ্জাল কে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দয়ায় চিহ্নিত কোরতে পেরেছি।**

বিশ্বনবীর সময় মানুষ যে বর্ত্তমানের জুডিও-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার মত আত্মাহীন একটি মহাশক্তি সম্বন্ধে ধারণা কোরতে অসমর্থ ছিলো, যে জন্য তাঁকে এ সম্বন্ধে রূপক (Alligorically) বর্ণনা কোরতে হোয়েছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ইবনে সাইয়াদের (রাঃ) ঘটনা ও ওটাকে এত গুরুত্ব দেয়া।

তিন ॥

আল্লাহর রসুল দাজ্জালের ফেত্না থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। [আয়েশা (রাঃ) থেকে বোখারী]

এই হাদীসটিকে আমি দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস বোলে মনে কোরি। কারণ লক্ষ্য কোরতে হবে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় কে চাইছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, সমগ্র মানবজাতির পথ প্রদর্শক, আল্লাহর কয়েক লক্ষ নবী- রসুলের (আঃ) নেতা, মাকামে মাহ্মুদায় যে একটি মাত্র মানুষকে আল্লাহ স্থান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মানুষ জাতির মুকুটমণি মোহাম্মদ বিন আবদ আল্লাহ (দঃ)। এই মানুষ যখন কোন ফেত্না অর্থাৎ বিপদ, সংকট, অশান্তি, গোলযোগ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে সে ফেত্না কত বড় ফেত্না সেটা বোঝাবার জন্য যুক্তি- তর্কের প্রয়োজন করে না। এখানে আমি আবার বোলছি, আল্লাহর রসুল দাজ্জালের আবির্ভাবকে যে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন আমাদের আলেম বোলে পরিচিত শ্রেণীটি তার **লক্ষ ভাগের এক ভাগও দেননি। যে ভয়াবহ ফেত্না থেকে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে, রবুবিয়াতকে প্রত্যাখ্যান কোরে সমস্ত মানব জাতিকে দিয়ে নিজেকে রব, প্রভু**

বোলে স্বীকার কোরিয়েছে, সেই দাজ্জালের চেয়ে এই শ্রেণীর কাছে দাড়ি, টুপি এবং অন্যান্য অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি অনেক বেশী প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ। কারণও আছে। আকীদার বিকৃতির জন্য এই দীনুল এসলামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, এর অস্তিত্বের কারণ এদের সামনে থেকে অদৃশ্য হোয়ে যেয়ে অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য এসে স্থান কোরে নিয়েছে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও বিকৃত হোয়ে গেছে। তাই তাদের কাছে প্রকৃত তওহীদ ও তওহীদ প্রতিষ্ঠার জেহাদের চেয়ে দাড়ি, টুপি, মোছ, পাজামার গুরুত্ব বেশী। এদের অগ্রাধিকারের ধারণা (আকীদা) সেই প্রতিবেশীদের মত যারা কপালে ডাকাতের গুলী লেগে নিহত গৃহস্বামীর মৃতদেহ দেখে বোলেছিলেন- ইস্! অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে। যাক্, এখানে ও বিষয় আলোচনার নয়, এখানে শুধু দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা (এ বিষয়ে পাঠকের কৌতুহল হোলে তাকে আমার লেখা "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি পড়তে অনুরোধ কোরছি)। আল্লাহর কাছে দাজ্জালের ফেত্না থেকে বিশ্বনবীর আশ্রয় প্রার্থনা বুঝিয়ে দেয় যে, দাজ্জালের আবির্ভাব কত বড় ঘটনা।

দাজ্জালের পরিচিতি

দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা বলার পর আল্লাহর রসুল তার সম্বন্ধে বেশ কতকগুলি চিহ্ন বোলে গেছেন যাতে তাঁর উম্মাহ দাজ্জাল কে দাজ্জাল বোলে চিনতে পারে ও সতর্ক হয়, তাকে গ্রহণ না করে এবং তার বিরোধিতা করে, তাকে প্রতিরোধ করে। এগুলো একটা একটা কোরে পেশ কোরছি। এক দিক দিয়ে বইয়ের এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দাজ্জাল কে দাজ্জাল বোলে আমরা যদি চিনতেই না পারি তবে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা বহু বেশী হোয়ে যায়। এ অনেকটা এমন যে শত্রু যদি বন্ধু সেজে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমরা তাকে শত্রু বোলে না চিনি তবে বিপদের ঝুঁকি কত বেশী হোয়ে যায়। এ জন্যই বোধহয় আল্লাহর রসুল দাজ্জাল কে যাতে আমরা সহজেই চিনতে পারি সেজন্য অনেকগুলি চিহ্ন বোলে গেছেন। কিন্তু ঐসঙ্গে এ কথাও বোলে গেছেন যে প্রকৃত মো'মেন ছাড়া, মহাপণ্ডিত হোলেও দাজ্জাল কে দাজ্জাল বোলে চিনতে পারবে না, যদিও দাজ্জালের কপালে "কাফের" শব্দটি লেখা থাকবে। আর মো'মেন নিরক্ষর হোলেও দাজ্জাল কে দাজ্জাল বোলে চিনতে পারবে (এই অধ্যায়েরই ১১ নং হাদীস)।

এক ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জাল ইহুদী জাতির মধ্যে থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদী ও মোনাফেকরা তার অনুসারী হবে।** [ইবনে হানবাল (রাঃ) থেকে মোসলেম]

এই হাদীসটির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না কারণ বর্ত্তমানের জড়বাদী (Materialistic) সভ্যতা যে ইহুদী জাতি থেকে জন্মেছে তা দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্বের এক নম্বর হাদীসেই বিশ্লেষণ কোরেছি। তাছাড়া এই সভ্যতার প্রচলিত নামই হোচ্ছে ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা (Judeo-Christian Technological Civilization)। নামকরণেই বংশ পরিচয় স্বীকার কোরে নেয়া হোয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে এর অনুসারী হবে তা তো স্বাভাবিক কিন্তু মহানবী যে মোনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত কোরলেন তার অর্থ হোচ্ছে এই যে, মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটি প্রায় সম্পূর্ণটাই দাজ্জাল কে তার দাবি মোতাবেক রব অর্থাৎ প্রভু বোলে মেনে নেবে এবং নিয়েছে। মোনাফেকদের সংজ্ঞা অর্থাৎ 'মুখে এক কথা বলা আর কাজে অন্যটা করা' অনুযায়ী এরা মোনাফেকের পর্যায়ে পড়ে। নিজেদের মোসলেম বোলে পরিচয় দিয়ে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাহ ও নানাবিধ এবাদত কোরেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের শেখানো মানুষের সার্বভৌমত্বকে জাতীয় জীবনে স্বীকার কোরে নেয়া যদি মোনাফেকী না হয় তবে আর মোনাফেকী কি?

দুই ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বোলে ঘোষণা কোরবে এবং মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিতে।** [বোখারী]

দাজ্জালের এই দাবী "আমাকে প্রভু বোলে স্বীকার করো" এর অর্থ কি? এর অর্থ হোচ্ছে এই যে দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে বোলবে যে, আমি মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা দিচ্ছি, যে আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা- ব্যবস্থা দিচ্ছি তা তোমরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করো। তোমরা বহু পুরাতন বেদ, মনু- সংহিতা ও কোরান- হাদীস নিঃসৃত যে আইন- কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি জীবনে প্রয়োগ কোরছিলে তা পুরানো, অচল ও বর্বর; ওগুলো ত্যাগ কোরে আমি যে অতি আধুনিক আইন- কানুন দিচ্ছি তা গ্রহণ করো ও তোমাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করো। তা হোলে তোমরা আমাদের মত সভ্য হবে, সমৃদ্ধিশালী, ধনী ও শক্তিশালী হবে। তোমাদেও জীবন যাত্রার মান আমাদের মত উন্নত হবে। আমরা যেমন স্বর্গসুখে আছি তোমরাও এমনি স্বর্গসুখ ভোগ কোরবে। দাজ্জাল রব, প্রভু হবার দাবী কোরছে কিন্তু স্রষ্টা হবার দাবী কোরছে না। পাশ্চাত্যের ইহুদী খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা ও শক্তি ঠিক এই প্রভুত্বের, রবুবিয়াতের দাবিই কোরছে, মানুষের স্রষ্টা হবার দাবি কোরছে না। **সে বোলছে ব্যক্তিগত জীবনে তোমরা হিন্দু, মোসলেম, খৃষ্টান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ যা থাকতে চাও থাকো এবং যত খুশি তোমাদের আল্লাহকে, ঈশ্বরকে, গডকে, এলীকে ডাকো। যত খুশি নামাজ পড়ো, রোযা করো, হজ্ব করো, প্রার্থনা করো আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে আমার রবুবিয়াহ্, প্রভুত্ব মেনে নাও।** এখানে তোমাদের স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরে আমি যে জনগণের, একনায়কের, কোন বিশেষ শ্রেণীর, সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি কোরেছি, তার যে কোন একটাকে মেনে নাও।

আজ মানবজাতি দাজ্জালের ঐ দাবি মেনে নিয়েছে এবং মেনে নেয়ায় দাজ্জাল মানবজাতিকে তার কাছে যে জান্নাতের মত জিনিসটি আছে তাতে প্রবেশ কোরিয়েছে। তাই আজ সমস্ত মানবজাতি জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। **একটি মাত্র দম্পতি থেকে সৃষ্ট হোয়েও**, একটিমাত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হোয়েও (কোরান সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুরা নেসা, আয়াত ১) মানুষ একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কোরছে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ কোরছে। দাজ্জালের অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে কেউ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হোয়ে জঘন্য বিলাস- ব্যাসনের মধে ডুবে আছে আর কেউ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, খেতে পরতে দিতে না পেরে নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চা সন্তানদের হত্যা কোরে নিজেরা আত্মহত্যা কোরছে, মা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা কোরছে, পেটের সন্তান অন্যের কাছে বিক্রি কোরে দিচ্ছে; আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের দণ্ডবিধি গ্রহণ করায় সর্বরকম অপরাধ চুরিডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ, ছিনতাই, খুনজখম, ধর্ষণ প্রতি দেশে, প্রতি জাতিতে ধাঁ ধাঁ কোরে বেড়ে চোলেছে; আল্লাহর দেয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ত্যাগ কোরে দাজ্জালের দেয়া আত্মাহীন, আল্লাহহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে।

সাজদা অর্থ আত্মসমর্পণ, কাউকে সাজদা করার অর্থ তার কাছে আত্মসমর্পণ কোরে তার আদেশ নির্দেশ মেনে চলা- তাই আল্লাহ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা নিষেধ কোরেছেন। কিন্তু মোসলেমসহ সমস্ত মানবজাতি আজ দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার পায়ে আত্মসমর্পণ কোরেছে, তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। এক কথায় এবলিস মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে, তওহীদ থেকে বিচ্যুত কোরে তাকে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত করার যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহকে দিয়েছিলো আজ তাতে সে সক্ষম হোয়েছে, আজ সে জয়ী অবস্থায় আছে।

তিন ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের বাহনের দুই কানের মধ্যে দূরত্ব হবে সত্তর হাত।** [আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আরবী ভাষায় সত্তর বোলতে সাতের পিঠে শুন্য দিলে যেমন ৭০ বোঝায় তেমনি এর আরও একটা ব্যবহার আছে। সেটা হোল কোন সংখ্যাকে বহু বা অসংখ্য বোঝাবার জন্যও ঐ সত্তর সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু ঐ সত্তর সংখ্যা দিয়েই করা হয়, অন্য কোন সংখ্যা, যেমন পঞ্চাশ বা একশ' দিয়ে করা হয় না। এই হাদীসটায় বিশ্বনবী দাজ্জাল যে বিশাল, বিরাট কিছু এই কথাটা রূপকের মাধ্যমে বোলেছেন। বাহনের দুই কানের মধ্যকার দূরত্ব বহু হাত হোলে, বাহনটা কত বড় এবং তাহোলে সেই বাহনের আরোহী কত বড়। এই প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি হাদীস পেশ কোরতে চাই। এ হাদীসটি আমি ছাত্রজীবনে ভারতের মধ্যপ্রদেশের একজন বড় আলেমের কাছ থেকে শুনেছিলাম। তখন ওটার উৎস লিখে রাখি নি এবং এখন আর কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। হাদীসটি হোল, আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের ঘোড়ার বা গাধার (বাহনের) এক পা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে, অন্য পা পশ্চিমপ্রান্তে হবে।** এ হাদীসটি আমি সহিহ বোলে বিশ্বাস কোরি, কারণ ওপরে আবু হোরায়রার (রাঃ) ঐ হাদীসটির এটি পরিপূরক ও একার্থবোধক। দু'টোরই অর্থ দাজ্জাল ও তার বাহন উভয়ই বিরাট, বিশাল ও পৃথিবীব্যাপী।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার চেয়ে বড়, এর চেয়ে শক্তিধর কিছুই নেই, এ কথায় কেউ দ্বিমত কোরতে পারবেন না, এটা সন্দেহাতীত সত্য। এই শক্তির কাছে সমস্ত পৃথিবী নতজানু হোয়ে আছে, এর পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। কারো সাধ্য নেই এই সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বা একে প্রতিরোধ করার। **আরোহী দাজ্জাল হোচ্ছে ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা আর তার ঘোড়া বা বাহন হোচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত যন্ত্র** (Scientific Technology)। এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত যন্ত্রই হোচ্ছে এর মহাশক্তি। এই সভ্যতার যন্ত্র আজ পৃথিবীর সর্বত্র। এ এত শক্তিশালী যে এর পারমাণবিক অস্ত্র (Nuclear weapons) আজ এই পৃথিবীকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। বিশ্বনবীর রূপক বর্ণনার শাব্দিক অর্থ নিয়ে যারা বিরাট এক ঘোড়ায় উপবিষ্ট একচক্ষু এক দানবের অপেক্ষায় আছেন, এই দুইটি হাদীসই তাদের ভুল ধারণা শোধরাবার জন্য যথেষ্ট মনে কোরি। দুই কানের মধ্যে শত শত বা হাজার হাজার হাত দূরত্ব বা পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই পা, এমন বাহন কি সম্ভব বা বাস্তব? এটা নড়াচড়া কোরবে কোথায়? এরপরও যারা ঐ ধারণা নিয়ে থাকবেন তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ধারণার (আকীদার) দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা কোরতে পারেন।

চার ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত। সে বায়ুতাড়িত মেঘের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চোলবে।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি]

এই হাদীসের বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার তৈরী এরোপ্লেন যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায় তখন যে সেটাকে বায়ুতাড়িত অর্থাৎ জোর বাতাসে চালিত মেঘের টুকরোর মত দেখায় তা কেউ অস্বীকার কোরতে পারবেন কি?

পাঁচ ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের আদেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি]

বর্ত্তমান ইহুদী খৃষ্টান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (Scientific Technology) আকাশে হালকা মেঘের ওপর এরোপ্লেন দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ (Chemicals) ছিটিয়ে বৃষ্টি নামাতে পারে এ কথা তথ্যাভিজ্ঞ প্রত্যেক লোকই জানেন। পৃথিবীর বিভিন স্থানে ঐ প্রক্রিয়ায় কৃষি কাজের জন্য বৃষ্টি নামানো হোচ্ছে। সন্দেহ হোলে যে কোন আবহাওয়া বিজ্ঞানীর (Meterologist) বা কৃষিবিদের (Agriculturist) কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

ছয় ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের গরু- গাভী, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ, ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলোর স্তনের বোটা বড় বড় হবে (যা থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ হবে)।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি]।

তথ্যাভিজ্ঞ প্রতিটি লোকই জানেন যে ইউরোপ, আমেরিকার অর্থাৎ পাশ্চাত জগতের Cattle অর্থাৎ গরু মহিষ, বকরী ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর আকার বাকি দুনিয়ার ঐসব গৃহপালিত পশুর চেয়ে অনেক বড়, কোন কোনটা একেবারে দ্বিগুণ এবং ওগুলো প্রাচ্যের পশুগুলির চেয়ে চারপাঁচ গুণ বেশী দুধ দেয়। ও দু'টোই ওরা সম্ভব কোরেছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে।

সাত ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জাল মাটির নিচের সম্পদকে আদেশ কোরবে ওপরে উঠে আসার জন্য এবং সম্পদগুলি ওপরে উঠে আসবে এবং দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে।** [নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি]

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার জন্মের আগে ভূগর্ভস্থ অর্থাৎ মাটির গভীর নীচের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত ছিলো। মাটির সামান্য নিচের কিছু কিছু সম্পদ মানুষ কখনো কখনো আহরণ কোরতে পারতো। এই সভ্যতার সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নতির

ফলে দাজ্জাল মাটির গভীর নীচ থেকে, এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেল, গ্যাস ইত্যাদি নানা রকমের খনিজ সম্পদ ওপরে উঠিয়ে আনতে সক্ষম হোয়েছে ও পৃথিবীময় তা ওঠাচ্ছে। এটাকেই মহানবী বোলেছেন যে, দাজ্জালের আদেশে মাটির নিচের সম্পদ ওপরে উঠে আসবে। তারপর ঐ সম্পদ দাজ্জাল কে অনুসরণ কোরবে তার অর্থ হোল এই যে, মাটির নিচ থেকে ওপরে উঠে আসার পর দাজ্জাল তা পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে, যেখানে ইচ্ছা পাঠাবে, ঐ সম্পদ দাজ্জালের যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জাহাজ, গাড়ী, যুদ্ধের যানবাহন ইত্যাদি সমস্ত কিছুতে ব্যবহার কোরবে। আজ বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়িত হোয়েছে।

আট ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। সেখান থেকে সে যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যারা তার বিরোধিতা কোরবে তাদের সে ঐ ভাণ্ডার থেকে রেযেক দেবে না। এইভাবে সে মোসলেমদের অত্যন্ত কষ্ট দেবে। যারা দাজ্জাল কে অনুসরণ কোরবে তারা আরামে থাকবে আর যারা তা কোরবে না তারা কষ্টে থাকবে।** [বোখারী ও মোসলেম]

এখানে প্রথমেই পরিষ্কার কোরে নেয়া দরকার যে রেযেক শব্দের অর্থ শুধু খাদ্যদ্রব্য নয়। রেযেক বোলতে খাদ্যদ্রব্য, বাড়ী-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, টাকা-পয়সা সবই বোঝায়। এক কথায় পার্থিব সম্পদ বোলতে যা বোঝায় তা সবই রেযেক। দাজ্জালের কাছে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে যে রেযেকের বিপুল ভাণ্ডার আছে এ কথা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সম্পদের সিংহভাগই তাদের দখলে। এই সম্পদ থেকে দাজ্জাল কাদের দেয়? শুধু তাদের দেয় যারা তাকে মেনে নিয়েছে, তাকে স্বীকার কোরেছে, স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান ত্যাগ কোরে দাজ্জালের সৃষ্ট তন্ত্রমন্ত্র, বাদ, নীতি গ্রহণ কোরেছে। যারা দাজ্জাল কে প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জাল তাদের দেয় না, যদিও আজ দাজ্জাল কে প্রত্যাখ্যান করার প্রায় কেউ নেই। সমস্ত পৃথিবীতে তার একক আধিপত্য ও প্রভুত্ব বিরাজ কোরছে।

আজ যদি কোন দেশ, জাতি বা জনগোষ্ঠী দাজ্জাল কে অস্বীকার কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে ও কোরান হাদীসের ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবন যাপন কোরতে চেষ্টা করে তবে কি হবে? নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতার কাছ থেকে শুধু সর্বপ্রকার সাহায্যই বন্ধ হোয়ে যাবে না, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের বিরোধিতা আরম্ভ হোয়ে যাবে। **এ বিরোধিতা শুধু দাজ্জাল নয়, দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় অবনত অন্যান্য জাতিগুলির মানুষও, যার মধ্যে 'মোসলেম' নামধারীরাও আছেন, তাদের কাছ থেকেও আসবে।** পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভাবক ইহুদী খৃষ্টান জগতের বাইরে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি ও দেশ দাজ্জালের মুখাপেক্ষী, তার কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যারা দাজ্জালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমষ্টিগত ব্যবস্থা স্বীকার কোরে নিয়েছে তাদের সে ভিক্ষা ও ঋণ দিয়ে কৃতার্থ কোরছে, বাঁচিয়ে রাখছে। দাজ্জাল ভিক্ষা না দিলে তারা না খেয়ে থাকে, দাজ্জাল ঋণ না দিলে তাদের সরকার অচল হোয়ে যায়, সমস্ত উন্নয়নমূলক (দাজ্জালের দৃষ্টিতে উন্নয়নমূলক) কর্মকাণ্ড বন্ধ হোয়ে যায়।

পৃথিবীর যে কোন দেশ বা জাতি দাজ্জালের একটু অবাধ্যতা কোরলেই তাকে সব রকম সাহায্য দেয়া বন্ধ (Economic Sanction) কোরে দেয়, তার ওপর অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক অবরোধ (Embargo) স্থাপন করে। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল (Consortium) ইত্যাদি, এক কথায় দাজ্জালের অধীনে যত কিছু আছে তার কোন কিছু থেকেই কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে বর্ত্তমানে দাজ্জাল যে Sanction ও Embargo আরোপ কোরে তার অবাধ্য জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়ে বশে আনতে চেষ্টা করে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহর রসুল ঠিক সেটাই ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন- শুধু আক্ষরিকভাবে ঐ Sanction ও Embargo শব্দ দু'টি ব্যবহার না কোরে।

নয় ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে।** [আব্দুলাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হবে অর্থ সে ডান চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না, যা দেখবে সবই বাঁ চোখ দিয়ে। আল্লাহ যা কিছু তৈরী কোরেছেন সব কিছুরই দু'টো বিপরীত দিক আছে। এই মহাসৃষ্টিও দৃশ্য ও অদৃশ্য, কঠিন ও বায়বীয়, আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি, দিন ও রাত্রি ইত্যাদি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর যে খলীফা পাঠালেন সেই মানুষের জন্যও তিনি নির্দ্ধারিত কোরলেন বিপরীতমুখী বিষয়। তার জন্যও তিনি নির্দিষ্ট কোরলেন দেহ ও আত্মা, জড় ও আধ্যাত্মিক, সত্য ও মিথ্যা, সওয়াব ও গোনাহ, ভালো ও মন্দ, ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়। এই দুইয়ের ভারসাম্যই হোচ্ছে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। তাঁর এই খলীফার জন্য যে দীন, জীবন- বিধান তিনি তাঁর নবী রসুলের মাধ্যমে প্রেরণ কোরলেন সেটার এক নাম দীনুল ফিতরাহ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক জীবন-ব্যবস্থা এবং সেই দীন যারা মেনে চোলবে আল্লাহ তাদের নাম দিলেন মিল্লাতান ওয়াসাতা, ভারসাম্যযুক্ত জাতি (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ১৪৩)। এই ভারসাম্যের দু'দিকের যে কোন দিককে বাদ দিলেই ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যাবে ও অস্বাভাবিক অপ্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ তাঁর খলীফা, মানুষ সৃষ্টি কোরে যে পরীক্ষা কোরতে চান তা ব্যর্থ হোয়ে যাবে।

পথভ্রষ্ট বনি- এসরাঈল জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত আল্লাহর নবী ঈসার (আঃ) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তাঁর শিক্ষাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি কোরলো। রাজনৈতিক, আর্থ- সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিহীন একটা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা, যেটার উদ্দেশ্যই ছিলো শুধু আত্মশুদ্ধির পরিত্যক্ত প্রক্রিয়াকে (তরিকা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেটা মানুষের সার্বিক জীবনে অচল এটা সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায়। এই অচল ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হোলে ইউরোপ যখন মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সংবিধান, রাজনৈতিক, আর্থ- সামাজিক, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি তৈরী কোরে নিলো তখন তারা

জীবনের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কোরে ফেললো। দু'চোখ দিয়ে না দেখে এক চোখ অন্ধ কোরে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখতে শুরু কোরলো। অন্ধ কোরলো ডান অর্থাৎ দক্ষিণ চোখটাকে।

ডান এবং বামের মধ্যে ডানকে নেয়া হয় উত্তম ও বামকে নেয় হয় অধম হিসাবে। কেয়ামতের দিন জান্নাতিদের আমলনামা, তাদের কাজের রেকর্ড বই দেয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামীদের দেয়া হবে বাম হাতে (কোরান- সুরা হাক্কাহ্, আয়াত ১৯, ২৫ ও সুরা ইনশিকাক, আয়াত ৭)। দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মা ডান দেহ বাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান মিথ্যা বাম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান, ইহকাল বাম, জড় ও আধ্যাত্মের মধ্যে আধ্যাত্ম ডান, জড় বাম ইত্যাদি। **ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার** (Judeo- Christian Materialistic Civilization) **ডান চোখ অন্ধ অর্থাৎ জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক সে দেখতে পায় না,** তার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তুর দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক, কারণ শুধু বাম চোখ দিয়ে সে জীবনের ঐ একটা দিকই দেখতে পায়। তাই বিশ্বনবী বোলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। এই ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বোলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু- পরমাণু থেকে শুরু কোরে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলংঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বোলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন সেই মহাব্যবস্থাপককে সে দেখতে পায় না, কারণ তার ডান চোখ অন্ধ।

দশ ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বোলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা তোমাদের জন্য জান্নাত হবে।** [আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং আবু হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

খৃষ্টধর্ম মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা ব্যর্থ হওয়ার পর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরী কোরে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হোল, যার নাম দেয়া হোল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy)। এই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রোইলো মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। অর্থাৎ মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও সেই সংবিধান নিঃসৃত আইন- কানুন প্রণয়ন কোরবে শতকরা ৫১ জন বা তার বেশী। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ

সামান্য জ্ঞানই দিয়েছেন সেহেতু সে এমন সংবিধান, আইন- কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি তৈরী কোরতে পারে না যা নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীন, যা মানুষের মধ্যকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার দূর কোরে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (এসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরী ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল আইন- কানুনের ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার প্রকট হোয়ে উঠলো। বিশেষ কোরে অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম অবিচার ও অন্যায় আরম্ভ হোয়ে গেলো। মুষ্টিমেয় মানুষ ধনকুবের হোয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গেলো আর অধিকাংশ মানুষ শোষিত হোয়ে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নেমে গেলো। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ কোরলো ও গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা কোরলো। ইউরোপের মানুষের অন্য একটা অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিকের ব্যর্থতা দেখে সেটা বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কোরলো। অর্থাৎ **গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো সবই অন্ধকারে হাতড়ানো, এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা তৈরী করা।** কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর থেকে যত তন্ত্র (- cr acy), যত বাদই (- i sm) চালু করার চেষ্টা ইউরোপের মানুষ কোরেছে সবগুলির সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে রোয়েছে। অর্থাৎ **রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, এসবগুলিই মানুষের সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন পর্যায় (Phase, st ep) মাত্র। এই সবগুলি তন্ত্র বা বাদের সমষ্টিই হোচ্ছে এই ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল ।**

এই দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে বোলছে মানুষের সমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রণালীই হোচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরী করা সংবিধান, সেই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করা মানুষের তৈরী করা আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা- ব্যাবস্থা ইত্যাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিক। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নাও, গ্রহণ করো তাহোলে তোমরা স্বর্গসুখে বাস কোরবে, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা- দীক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান এমন উন্নীত হবে, এমন ভোগবিলাসে বাস কোরতে পারবে যে তা জান্নাতের সুখের সমান। আর যদি আমাদের এই নীতি তোমরা গ্রহণ না করো, তবে তোমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা অশিক্ষার মধ্যে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ কোরতে থাকবে। যারা দাজ্জালের কথায় বিশ্বাস কোরে ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন জীবন- ব্যবস্থা মেনে নেবে তাদের সে গ্রহণ কোরে তার জান্নাতে স্থান দেবে, তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বতোভাবে সাহায্য কোরবে। আর যারা দাজ্জালের জীবন- ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরবে তাদের সে তার বিরাট ধন ভাণ্ডার থেকে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে না, তাদের সে রাজনৈতিক, সামরিকভাবে বিরোধিতা কোরবে অর্থাৎ সে তাদের তার জাহান্নামে নিক্ষেপ কোরবে।

দাজ্জাল যে মানবজাতিকে উপরোক্ত কথা বোলছে তা নির্দিষ্ট ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করার দরকার করে না। পাশ্চাত্যের সমস্ত প্রচার যন্ত্রগুলি এই কথা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, স্থুল ও সুক্ষ্মভাবে বোলে যাচ্ছে যে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদ অন্তর্ভুক্ত), তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত), তাদের শিক্ষা- ব্যবস্থা (যেটা সম্পূর্ণভাবে

জড়বাদী, বস্তুবাদী, যেখানে আত্মার শিক্ষার কোন স্থান নেই), তাদের সামাজিক ব্যবস্থা (যেখানে অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোলে গৃহীত, যেখানে সমকামিতা আইনসঙ্গত), তাদের তৈরী করা দণ্ডবিধি সবই সর্বোত্তম, প্রগতিশীল, আধুনিক। ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হোতে পারে না। ওর বাইরে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাব্যবস্থা আছে সব গোঁড়া, পশ্চাৎমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও হাস্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহর রসুল বোলেছেন- যারা দাজ্জালের জীবন- ব্যবস্থা স্বীকার কোরে নেবার ফলে দাজ্জালের জান্নাতে স্থান পাবে তারা দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা জাহান্নাম। আর যারা দাজ্জাল কে অস্বীকার করার দরুন তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে দেখবে তারা জান্নাতে আছে। আল্লাহর রসুলের কথা সত্য কিনা যাচাই কোরে দেখা যাক। এই যাচাইয়ের সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে **গণতন্ত্র থেকে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদ (Communi sm) পর্যন্ত পৌঁছলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রটা মিলিয়ে একটাই বিষয় ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, দাজ্জাল এবং দাজ্জালের মৃদু থেকে উগ্রতম রূপ।** অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে দাজ্জালের ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া।

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সভ্যতা, জীবন- ব্যবস্থা এই প্রচারণায় বিশ্বাস কোরে যে জনসমষ্টি, জাতি বা দেশ তা গ্রহণ কোরেছে অর্থাৎ দাজ্জালের জান্নাতে, স্বর্গে প্রবেশ কোরেছে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা কোরলে দেখা যায় প্রতারিত হোয়ে প্রবেশ করার পর অতি শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে জাহান্নামে, নরকে প্রবেশ কোরেছে। কথাটা ভালো কোরে বোঝার জন্য দাজ্জালের উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ (কমিউনিজমকে) বিবেচনায় নেয়া যাক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে- এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হোয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। যারা ঐ দেশগুলোর রেডিও মোটামুটি নিয়মিতভাবে শুনে এসেছেন তাদের এ কথা বোলে দেবার দরকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই স্বর্গ (Par adi se) বোলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ কোরে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বিশ্বনবী ঠিক ঐ জান্নাত অর্থাৎ Par adi se শব্দটাই ব্যবহার কোরেছেন। দাজ্জালের স্বর্গ Par adi se যদি সত্যই স্বর্গ হোয়ে থাকে তবে যারা সেখানে প্রবেশ কোরবে তারা নিশ্চয়ই আর কখনই সেখান থেকে বের হোয়ে আসার চিন্তাও কোরবে না, এ কথা তো আর মিথ্যা হোতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি হোয়েছে? কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্য্যকরী করার কিছু পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেললো।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কি হোচ্ছে না হোচ্ছে সে সম্বন্ধে শাসকরা যেটুকু খবর বাইরে যেতে দিতো তার বেশী আর কোন খবর বাকি পৃথিবীর কেউ পেতো না। এই বিচ্ছিন্নতা অতি শিগ্‌গিরই এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছলো যে বাকি দুনিয়ায় এর নাম হোয়ে গেলো I r on Cur t ai n, লোহার পর্দা। এ পর্দা এমন দুর্ভেদ্য হোয়ে দাঁড়ালো যে, বিরাট দেশটার সাধারণ সড়ক বা বিমান দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত বাকি দুনিয়ার মানুষ জানতে পারতো না। পরবর্ত্তীতে যখন চীন ঐ জীবন- ব্যবস্থা গ্রহণ কোরলো, দাজ্জাল কে রব স্বীকার কোরে দাজ্জালের উগ্রতম পর্যায় সাম্যবাদী জীবন- ব্যবস্থা গ্রহণ কোরলো তখন সেখানেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, চীন বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেললো এবং এর নাম হোয়ে গেলো Bamboo Cur t ai n, বাঁশের পর্দা।

এই দুই বিরাট দেশের শাসকরা এই বিচ্ছিন্নতার নীতি কেন গ্রহণ কোরলেন? **একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে কোন দেশ জাতি বা সমাজ যদি স্বর্গে পরিণত হয় তবে তো সেই জাতির শাসকদের ঠিক উলটো করা উচিত।** পর্দা দেবার বদলে তাদের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ছিলো সমস্ত দ্বার খুলে দেয়া; বাকি পৃথিবীকে বলা যে- দ্যাখো! আমরা বোলছি আমরা স্বর্গসুখে আছি এ কথা সত্য কিনা। তাদের কর্ত্তব্য ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে বলা যে, **আমরা পাসপোর্ট প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ স্বর্গ ছেড়ে যদি কোথাও যেতে চাও যাও, কোন বাধা দেবো না।** তাদের কর্ত্তব্য ছিলো বাকি পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা- **আমরা ভিসা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এসে দেখে যাও আমরা জান্নাতে (Par adi se) আছি কিনা।** পরবর্ত্তীতে ঠিক ঐ ব্যাপার চীনেও হোল। সাম্যবাদ, কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত কমিউনিষ্ট দেশগুলি যে নিজেদের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে রেখেছিলো, তাদের জনগণের সাথে বাইরের পৃথিবীর জনগণের সামান্যতম সংযোগ ছিলো না এ কথা কোন তথ্যাভিজ্ঞ (I nf or med) মানুষই অস্বীকার কোরতে পারবেন না, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ দেশগুলির বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ ছিলো শুধুমাত্র ওপরের তলার শাসকদের সঙ্গে, আর কারো সঙ্গে নয়।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ব্যাপারেই নয়, যখনই যে দেশ দাজ্জালের উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার স্বর্গে প্রবেশ কোরেছে, তখনই সে দেশকে সোভিয়েত ও চীনের মত বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেলতে হোয়েছে।

'স্বর্গে' প্রবেশ কোরেও ঐ উল্টো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া ঐ সব দেশের শাসকদের আর কোন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। তার কারণ হোল এই যে, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই স্বর্গে প্রবেশ করার পর সেসব দেশের জনসাধারণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারলো যে এ তো স্বর্গ নয়, এ তো নরক। কিন্তু তখন বেশী দেরী হোয়ে গেছে। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলো ঐ স্বর্গ থেকে বের হোয়ে আসার জন্য। সহজ কথা নয়, কারণ ও স্বর্গ থেকে বের হবার অর্থ নিজেদের দেশ, লক্ষ স্মৃতি জড়ানো প্রিয় জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ কোরে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অচেনা সমাজে বাস করা, যাদের ভাষা পর্যন্ত তাদের অজানা। কিন্তু অনস্বীকার্য্য ইতিহাস এই যে ঐসব দেশের জনসাধারণ তাদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অজানা দেশে চোলে যাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই চেষ্টায় তারা পরিবারের অন্যদের প্রাণও বিপন্ন কোরেছে, সহায়- সম্পদ বিসর্জন তো ছোট কথা।

কমিউনিষ্ট পূর্ব বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে লোক পালিয়ে যাওয়া বন্ধ কোরতে রাশিয়ানরা বিখ্যাত বা কুখ্যাত বার্লিন দেয়াল তৈরী কোরলো। তবুও মানুষ পালানো বন্ধ করা যায় না দেখে দেয়ালের ওপর প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর স্তম্ভ (Wat ch t ower) তৈরী কোরে সেখানে মেশিনগান বসানো হোল। হুকুম দেয়া হোল কাউকে দেয়াল টপকে পালাতে দেখলেই গুলী কোরে হত্যা কোরতে। তবু লোক পালানো বন্ধ হয় না দেখে পরিখা খোড়া হোল, কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হোল ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসানো হোল পলায়নকারীদের খুঁজে বের কোরে হত্যা বা বন্দী করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই 'স্বর্গ' থেকে পালানো বন্ধ করা গেলো না। ঐ সময়ের খবরের কাগজ যারা নিয়মিত পড়েছেন, রেডিও শুনেছেন তাদের কাছে 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় গ্রেফতার, গুলী কোরে হত্যা ইত্যাদি দৈনন্দিন খবর ছিলো। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত ২৭ লাখ নর- নারী, শিশু কমিউনিষ্ট স্বর্গ থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ ঐ পালাবার চেষ্টায় নিহত হয়, বন্দী হয়।

'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় বহু লোক সফল হোয়েছে, বহু লোক বিফল হোয়েছে, বন্দী হোয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। শাসকরা পালানোটা প্রায় অসম্ভব কোরে তোলার পর মানুষ মরিয়া হোয়ে বিকল্প পথ ধরলো। একদল বেলুনে চড়ে রাশিয়ার সীমান্ত পার হোল, অনেকে নদী ও পরিখা সাঁতরে পার হোল, অবশ্য পরিখাগুলি সাঁতরে পার হোতে যেয়ে অনেকে গুলী খেয়ে মারা পড়লো। দু'টি পরিবার এক অভিনব পন্থায় পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে এসে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিলো।

পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হোয়ে পূর্ব জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হওয়ার পর রেল লাইনগুলিকে নতুন সীমান্তে দেয়াল দিয়ে বন্ধ কোরে দেয়া হোয়েছিলে। ঐ দু'টি পরিবার অতি কৌশল ও চেষ্টায় একটি রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে। তারপর ঐ দুই পরিবারের নারী ও শিশুদের তাতে উঠিয়ে পুরুষরা তীব্রগতিতে ঐ ইঞ্জিনটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে চোলে আসে। আরও বিভিন্ন উপায়ে বহু নারী- পুরুষ শিশু তাদের প্রিয় জন্মভূমি, দেশ, আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু- বান্ধব সমস্তের মায়া ত্যাগ কোরে প্রাণ হাতে নিয়ে একদিন যেটাকে স্বর্গ ভেবেছিলো তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কোরেছে।

এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারেই নয়, যে জনসমষ্টিই ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের স্বর্গে প্রবেশ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটাকে গ্রহণ কোরেছে, তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছে যে, তারা নরককে স্বর্গ মনে কোরে তাতে প্রবেশ কোরেছে।

চীনেও ঐ একই ব্যাপার হোয়েছে। মোহভঙ্গের পর হাজার হাজার চীনা তাদের দেশ থেকে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছে, বন্দী হোয়েছে। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালী সাঁতরে পার হোয়ে বৃটিশ শাসিত হংকং- এ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় বহু চীনা ডুবে মারা গেছে। যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে যাবার পর সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কমিউনিষ্টদের হাতে চোলে যাবার পর সে দেশ থেকে মানুষ পালানোর যে বিরাট হিড়িক পোড়ে গিয়েছিলো ও তা বহু বছর পর্যন্ত চলেছে সে খবর জানা নেই এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। ছোট বড় নৌকা বোঝাই কোরে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ মানুষ সমুদ্রে ভেসেছে। তারা কোথায় পৌঁছবে, কোন্ দেশে আশ্রয় পাবে কিছুই না জেনেও তারা **শুধু দাজ্জালের 'স্বর্গ' থেকে পালাবার জন্য মরিয়া হোয়ে যে নৌকায় একশ' জনের স্থান হবে সে নৌকায় পাঁচ সাতশ' মানুষ ভর্ত্তি হোয়ে সমুদ্রে ভেসেছে।** হাজার হাজার নৌকা জোর বাতাসে, ঝড়ে ডুবে গেছে, হাজার হাজার নৌকা জলদস্যুরা (Pi r at es) আক্রমণ কোরে লুটে নিয়েছে, মানুষদের হত্যা কোরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ কোরেছে, তাদের বিদেশে বিক্রি কোরে দিয়েছে।

এ সমস্ত খবর হাজার হাজার বার সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোয়েছে, বহু ছবি ওগুলিতে ছাপা হোয়েছে। সেই সব লোমহর্ষক খবর পড়ে, ছবি দেখে পৃথিবীর মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এতো সংখ্যায় এতো বার এই পালানোর চেষ্টা হোয়েছে যে এদের জন্য একটা আলাদা শব্দই সৃষ্টি হোয়েছে- The Boat Peopl e - নৌকার মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এখন এদের এই নামেই উল্লেখ করে। ভিয়েতনামেও এসব খবর পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও ঐ স্বর্গের অধিবাসীদের ফেরাতে পারে নি। তারপরও তারা স্ত্রী পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে নৌকা অতিরিক্ত বোঝাই কোরে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমন একটাও দেশ নেই যেখানে 'স্বর্গ' থেকে পলায়নকারী আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য বড় বড় শিবির (Camp) খুলতে না হোয়েছে। এই সেদিন হংকং- এর আশ্রয় শিবির থেকে লোকজনকে ভিয়েতনামের 'স্বর্গে' ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে হংকং পুলিশের যে তুমুল সংঘর্ষ হোয়ে গেলো, যাতে পুলিশসহ 'স্বর্গের' ভূতপূর্ব বাসিন্দাদের কয়েকজন মারা গেলো সে সংবাদ ও ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছাপা হোয়েছিলো (এটি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের অর্থাৎ বইটি প্রথমবার প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বের ঘটনা)। ঐ একই অবস্থা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশের। কমিউনিষ্ট কিউবার একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অস্থায়ীভাবে বাস কোরছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে।

দাজ্জালের ঘোষিত জান্নাত যে সেটার অধিবাসীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মনে হয় কোরিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া দেশটি দু'টি ভাগে ভাগ হোয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং এ ভাগ আজও আছে। দু'টোই দাজ্জালের পূজারী। শুধু তফাৎ হোচ্ছে এই যে দক্ষিণ কোরিয়া দাজ্জালের পূর্বতন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক- ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আছে আর উত্তর কোরিয়া দাজ্জালের উগ্রতর পর্যায়ের সাম্যবাদী একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার অধীনে আছে।

১৯৫২ সালে এই দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলো। উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো কমিউনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলো জাতিসংঘের (United Nations) অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেকগুলো অ- কমিউনিস্ট দেশ। যুদ্ধ চললো তিন বছর। তারপর সন্ধি হোল। সন্ধির অনেকগুলো শর্ত্তের মধ্যে একটি শর্ত্ত হোল যুদ্ধবন্দী বিনিময়। এ বিনিময়ের শর্ত্তের মধ্যে একটি শর্ত্ত হোল এই যে, কোন পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর কোরে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যারা নিজেদের ইচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যেতে চাইবে শুধু তাদেরই ফেরত পাঠানো যাবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হোয়ে যাবার পর দেখা গেলো যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়ার অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের হাতে অ- কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ১২, ৭৬০ (বার হাজার সাতশ' ষাট) জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৪৭ (তিনশ' সাতচলিশ) জন ফিরে আসতে অস্বীকার কোরলো, অর্থাৎ তারা কমিউনিস্ট দেশেই থেকে গেলো। এদের মধ্যে ২১ (একুশ) জন আমেরিকানও ছিলো।

অপরদিকে জাতিসংঘের অধীনে দেশগুলোর অর্থাৎ অ- কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিস্টদের ৭৫, ৭৯৭ (পঁচাত্তর হাজার সাতশ' সাতানব্বই) জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার কোরলো ৪৮, ৮১৪ (আটচলিশ হাজার আটশ' চৌদ্দ) জন। এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ায় জাতিসংঘ এক সমস্যার সম্মুখীন হোয়ে পোড়েছিলো। পরে এদের ফিলিপাইনে, ফরমোসা ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোরে দেয়া হয়। যাদের মনে এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসবে তারা কোরিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, বৃটিশ বিশ্বজ্ঞান কোষ (Encyclopedia Britannica) দেখে নিতে পারেন বা সরাসরি জাতিসংঘে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

এই ঘটনার পর আর কোন সন্দেহ কি থাকতে পারে যে কমিউনিস্টদের **বহু ঘোষিত 'স্বর্গ' (Paradise) প্রকৃতপক্ষে সেটার অধিবাসীদের জন্য নরক?** ওটা যদি নরক নাও হোয়ে শুধু বাইরের দুনিয়ার অর্থাৎ অ- কমিউনিস্ট দেশ ও জাতিগুলোর অবস্থার মত হতো তবে ঐ হাজার

হাজার যুদ্ধবন্দীরা সকলেই অবশ্যই তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতো। কারণ উভয় স্থানের অবস্থা সমান বা মোটামুটি সমান হলেও একদিকের পালায় রোয়েছে তাদের প্রিয় দেশ, জন্মভূমি, বাবা- মা, ভাই- বোন, স্ত্রী- ছেলেমেয়ে, বন্ধু- বান্ধব, শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বাসস্থান। ঐ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যদি হাজার হাজার মানুষ অজানা দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহোলে নিশ্চিতই বলা যায় যে, ঐ লোকগুলো তাদের দেশকে জাহান্নাম বা নরক বোলে বিশ্বাস করে। ফেরত না যাওয়া ঐ সংখ্যা থেকেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে ২৬, ৯৮৩ (প্রায় সাতাশ হাজার) যুদ্ধবন্দী নিজেদের কমিউনিস্ট দেশে ফিরে গেলো তারা ফিরে গেছে দাজ্জালের স্বর্গের জন্য নয়, গেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র- কন্যা, বাপ- মা'র, বন্ধু- বান্ধবের, আত্মার সাথে জড়ানো, মায়া মমতায় ঘেরা জন্মভূমিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ কোরতে না পেরে। ঐগুলোর মায়া ত্যাগ কোরতে না পেরে তারা জেনে- শুনেই নরকই বেছে নিয়েছে। **সন্ধির শর্ত্তের মধ্যে যদি এই শর্ত্তও যোগ করা হতো যে, যেসব যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে না তাদের পরিবারকেও এনে তাদের কাছে দেয়া হবে তবে এ সাতাশ হাজারের মধ্যে সাতশ' জনও ফিরে যেতো কিনা সন্দেহ আছে।**

এখন প্রশ্ন হোল- এ কী রকম 'স্বর্গ' যে স্বর্গের অধিবাসীরা সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রাণ হাতে নেয়, সমুদ্র সাঁতরে পার হবার চেষ্টায় ডুবে মরে, ছোট ছোট নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, ইলেকট্রিক কাঁটা তারের শক্ খেয়ে মরে, 'স্বর্গরক্ষীদের' গুলী খেয়ে মরে এবং শত্রুর হাতে বন্দী হোলে জন্মভূমি, স্ত্রী- পুত্রের মায়া ত্যাগ কোরে আবার 'স্বর্গে' ফিরে যেতে অস্বীকার করে! এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে। সেটা হোল- তবে কি যেসব দেশ কমিউনিজম গ্রহণ কোরেছে শুধু সেইসব দেশ জাহান্নামের মত, আর যে সব দেশ করে নি সেগুলো জান্নাতের মত? না, তা নয়। আমি পেছনে বোলে এসেছি যে- জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামরিক, আর্থ- সামাজিক ইত্যাদি কোন বিষয়েই খৃষ্টান ধর্মের কোন নির্দেশনা, এমনকি বক্তব্য পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও ওটাকে সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগের চেষ্টায় অবধারিত ব্যর্থতা **যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দিলো, স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে এলো তখনই দাজ্জালের জন্ম হোল।**

তারপর জন্মের পর যেমন কোন প্রাণী ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে একটার পর একটা ধাপ বা পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবনেও ধাপ, পর্ব (Phase) এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হোয়েছে একনায়কতন্ত্র (Di ct at or shi p) । ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতর রূপ সাম্যবাদ, কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের, ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হোয়েছে, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস কোরলো। কিন্তু তার পরপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Col d war) শুরু হোয়ে গেলো। এই ঠাণ্ডা লড়াই কোরিয়ায়, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো দু'চার জায়াগায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shoot i ng war) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারে হয় নি শুধু একটি মাত্র কারণে। সেটা হোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের উভয়ের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছিলো। উভয়েই জানতো যে এ অস্ত্র ব্যবহার কোরলে উভয়কেই ধ্বংস হোতে হবে। এই পরিস্থিতিই Det er ent হিসেবে কাজ কোরে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধতে দেয় নি। নিজেদের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা থেকে উভয়পক্ষকে বিরত রেখেছে।যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম Det er ent , দা'তাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে **দাজ্জালের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মত পর্যায় আসলেও এবং**

কখনো কখনো ঐ পর্যায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হোলেও দাজ্জাল একটিই মহাশক্তিধর আত্মাহীন দানব ইহুদী-খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা, Judeo-Christian Materialistic Civilization।

কাজেই কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার যেসব যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরে গেলো না তারা শুধু দাজ্জালের স্বর্গের উগ্রতম অবস্থা থেকে কিছু নম্রতর অবস্থায় ফিরে এলো মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধোত্তর বন্দী বিনিময় অংকের হিসাব প্রমাণ কোরে দিয়েছে মহানবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যেটায় তিনি বোলছেন দাজ্জালের সঙ্গে একটি জান্নাতের মত আরেকটি জাহান্নামের মত জিনিস থাকবে। সে মানবজাতিকে আহ্বান কোরে বোলবে আমাকে তোমরা রব (প্রভু) বোলে মেনে নাও (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ কোরে আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও)। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে (ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ কোরবে) সে তাদের তার জান্নাতে স্থান দেবে এবং সেটা তাদের জন্য জাহান্নাম হবে, আর যারা তাকে রব বোলে স্বীকার কোরবে না সে তাদের তার জাহান্নামে দেবে এবং সেটাই তাদের জন্য জান্নাত হবে। আজ শুধুমাত্র মক্কা ও মদীনা ছাড়া বাকি সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম।

এগারো ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না।** [আবু হোরায়রা (রাঃ), আবু হোযায়ফা (রাঃ) এবং আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

এই হাদীসটি শুধু অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। মো'মেন হোলে লেখাপড়া না জানলেও, নিরক্ষর হোলেও তারা পড়তে পারবেন আর মো'মেন না হোলে, শিক্ষিত হোলেও, পণ্ডিত হোলেও দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারবেন না, এই কথা থেকেই এটা পরিষ্কার যে, **দাজ্জালের কপালের ঐ লেখা কাফ্, ফে, রে এই অক্ষরগুলো দিয়ে লেখা নয়।** মো'মেনরা নিরক্ষর হলেও ঐ লেখা দেখতে ও পড়তে পারবেন। মো'মেন কারা? আল্লাহ কোরআনে বোলেছেন- শুধু তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর আর তাতে কোন সন্দেহ করে না, এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে; তারাই হোল খাঁটি (কোরান- সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)।

এখানে মনে রাখতে হবে যে 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে' এ কথার অর্থ **যারা আল্লাহর সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করে না।** দাজ্জাল কে রব বোলে স্বীকার কোরে নেয়ায় প্রায় সম্পূর্ণ মোসলেম দুনিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ব্যক্তি জীবনে কোণঠাসা কোরে রেখে আকীদার (Comprehensive Concept) বিকৃতির কারণে কার্য্যতঃ মোশরেক ও কাফের হোয়ে গেছে। কাজেই বৃহত্তর জীবনে দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা অর্থাৎ দাজ্জাল যে সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী কাফের এটা তারা দেখতেও পান না সুতরাং পড়তেও পারেন না। কিন্তু জীবনের প্রতি অঙ্গনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে যিনি বিশ্বাসী, অর্থাৎ মো'মেন তিনি নিরক্ষর হোলেও দাজ্জাল যে কাফের তা দেখতে ও বুঝতে পারেন অর্থাৎ তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারেন।

বিশাল বাহনে (যান্ত্রিক প্রযুক্তি) আসীন দানব বোলে দাজ্জাল কে (ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা) যেমন রসুলাল্লাহ রূপকভাবে বর্ণনা কোরেছেন দাজ্জালের কপালে লেখাও তেমনি রূপক বর্ণনা, অক্ষর দিয়ে লেখা নয়। অন্য হাদীসে বিশ্বনবী বোলেছেন- **সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের পদতলে আসবে** (হাদীস- ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম, মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর)। পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটির সামান্য অংশ বাদে সবটাই দাজ্জাল কে (ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা) দাজ্জাল বোলে চিনতে না পেরে তাকে বন্ধুভাবে নিয়ে তার আদেশ অনুসারে চোলবে, তার পায়ে সাজদায় পতিত হবে। মহানবীর কথায় বোঝা যায়, যেহেতু সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণে আসবে সেহেতু এই জাতিটিও দাজ্জালের পদতলে, নিয়ন্ত্রণে আসবে, অর্থাৎ তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নেবে। তাই আমরা দেখি মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটির প্রায় সমস্ত মানুষ দাজ্জাল কে রব বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে কিন্তু ওদিকে মহা- পরহেযগার, মুত্তাকী। এমন কি এই জাতির মধ্যে কয়েকটি দেশ আছে যাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কপালে সাজদার কালো দাগ আছে কিন্তু তারা দাজ্জালের আশ্রয়ে থেকে, দাজ্জালের কাছ থেকে অস্ত্রসহ

সবরকম সাহায্য নিয়ে তাদের দেশের মধ্যে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ প্রতিষ্ঠা কোরতে চান তাদের বন্দী কোরছেন, নির্যাতন কোরছেন, গুলী কোরে ফাঁসি দিয়ে হত্যা কোরছেন। এর কারণ এসব নেতাসহ মোসলেমবিশ্ব দাজ্জালের শেখানো এই কথা বিশ্বাস কোরে নিয়েছেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়, সমষ্টিগত নয়, তাই তারা দাজ্জালের কপালে কাফের লেখা দেখতে ও পড়তে পারেন না।

বারো ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে।** [আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে শারহে সুন্নাহ]

সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেমন দাজ্জাল কে প্রভু বোলে স্বীকার কোরে নেবে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটিও তেমনি দাজ্জাল কে রব বোলে স্বীকৃতি দেবে এ কথা পেছনে স্থানে স্থানে বোলে এসেছি। এবার রসুলাল্লাহর হাদীস দিয়ে এ কথার প্রমাণ হোচ্ছে। পেছনে বোলে এসেছি আরবী ভাষায় কোন কিছু বহু, অসংখ্য, অগণিত বোঝাতে ঐ সত্তর সংখ্যা ব্যবহার হয়। ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাকে সমস্ত ইহুদীরা যে সমর্থন কোরবে তার স্বাভাবিক কারণ ওটা তাদেরই সৃষ্টি। তাদের সমর্থনকে বর্ণনা করার সময়ও রসুলাল্লাহ ঐ সত্তর সংখ্যাই ব্যবহার কোরেছেন, বোলেছেন- **সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জাল কে অনুসরণ কোরবে**(হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে মোসলেম)। দু'টো হাদীসেই কি পরিমাণ মানুষ দাজ্জাল কে রব বোলে মেনে তাকে অনুসরণ কোরবে তা বোলতে যেয়ে বিশ্বনবী ইহুদী এবং তাঁর উম্মাহ অর্থাৎ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতি, উভয়টার সম্বন্ধেই একই শব্দ ব্যবহার কোরেছেন- সত্তর হাজার। তাহোলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে **ইহুদী খৃষ্টানরা যেমন সবাই তাদের নিজেদের সৃষ্ট ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতাকে, দাজ্জাল কে রব বোলে স্বীকার কোরে নেবে ঠিক তেমনি মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটিও তাই নেবে।** প্রকৃত অবস্থাও তাই। আরবের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া সমস্ত মোসলেম বিশ্ব দাজ্জালের, ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার তৈরী রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হোচ্ছে। আল্লাহর দেয়া আইন, দণ্ডবিধি প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের তৈরী আইন দণ্ডবিধি অনুযায়ী মোসলেম বিশ্বের আদালতগুলোতে বিচার হোচ্ছে, শাস্তি দেয়া হোচ্ছে। ন্যায়- অন্যায়, ভালো- মন্দের, নৈতিকতার আল্লাহর দেয়া মানদণ্ড পরিত্যাগ কোরে এই জাতি এখন দাজ্জালের দেয়া মানদণ্ড ও মূল্যবোধ গ্রহণ কোরেছে।

দাজ্জালের নাম উল্লেখ না কোরেও তাকে ইহুদী- খৃষ্টান বোলে মহানবী কয়েকটি হাদীসে তাঁর উম্মাহর দাজ্জাল কে স্বীকার কোরে নেবার কথা বোলেছেন। তিনি বোলেছেন- **ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্ত্তীদের পদে পদে অনুসরণ কোরবে, এমন কি তারা যদি গুইসাপের (সরীসৃপের) গর্ত্তেও প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ কোরে সেখানেও প্রবেশ কোরবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হোল- হে রসুলাল্লাহ!** (যাদের অনুসরণ করা হবে) **তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? তিনি জবাব দিলেন-** (তারা ছাড়া) **আর কারা (**হাদীস- আবদুলাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে তিরমিযি এবং মুয়াবিয়াহ (রাঃ) থেকে আহমদ ও আবু দাউদ) ! অন্য একটি হাদীসে

মহানবী বোলেছেন- **ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মত ইহুদীদের অনুসরণ ও অনুকরণ কোরতে কোরতে এমন পর্যায়েও যাবে যে তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মতের মধ্য থেকে তাও করা হবে** (হাদীস- আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম)।

এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রসুলাল্লাহ ইহুদী ও খৃষ্টান বোলেছেন, দাজ্জাল শব্দটা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এই বিষয়ে অন্যান্য হাদীসগুলো পর্যালোচনা কোরলে এবং তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জাল কে অনুসরণ করার হাদীসকে যোগ কোরলে কোন সন্দেহ থাকে না যে, বর্ত্তমান ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা হোচ্ছে দাজ্জাল আর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতি শুধু ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া আর সর্বতোভাবে দাজ্জাল কে রব, প্রভু বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে, তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। জাতীয় জীবনে, যেটা আসল জীবন, সেই সমষ্টিগত জীবনের প্রতি বিষয়ে কপালে কাফের লেখা দাজ্জাল কে অনুসরণ কোরেও আকীদার বিকৃতির কারণে নামায, রোযা, ইত্যাদি নানা রকম নিষ্ফল এবাদত কোরে যাচ্ছে।

দাজ্জালের আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে জাতীয় জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসন দেয়াকে অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে যারা স্বীকার কোরে নিয়েও মহা এবাদতে ব্যস্ত আছেন তারা **"জাতীয় জীবনই এসলামে মুখ্য ও প্রধান, ব্যক্তি জীবন গৌণ",** আমার এ অভিমতের বিরোধিতা কোরবেন তা জানি। এ কথা আমি কোরান এবং হাদীস থেকে হাজার বার প্রমাণ কোরতে পারি। কিন্তু তা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বোলে শুধু একটা কথা তাদের কাছে পেশ কোরবো। এই দীনের পাঁচটি ফরদে আইন, অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত, মাত্র একটি ব্যক্তিগত। ঈমান (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) অর্থাৎ তওহীদ, সালাহ (নামায), হজ্ব ও যাকাহ- সব ক'টিই সমষ্টিগত শুধুমাত্র রোযা ব্যক্তিগত। এ জাতির একটি অংশ এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও দাজ্জাল কে রব বোলে মেনে নিয়েছে।

তেরো ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ- ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মত তার করায়ত্ত হবে।** [মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর]

বর্ত্তমানের ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই (Judeo Christian Technological Civilization) যে দাজ্জাল এ সিদ্ধান্ত যারা অস্বীকার কোরবেন বা তাতে সন্দেহ কোরবেন তারা মেহেরবানী কোরে আমাদের বোলে দেবেন কি তাহোলে রসুলাল্লাহ তাঁর ঐ হাদীসে কাকে বা কি বোঝাচ্ছেন? সমস্ত পৃথিবীর মাটি ও পানি (Land and Sea) অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাকে আজ কোন্ মহাশক্তি আচ্ছন্ন কোরে আছে? তারা একটু চিন্তা কোরলেই দেখতে পাবেন যে, ঐ শক্তি অবশ্যই পাশ্চাত্যের ঐ ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা। সমস্ত পৃথিবীতে আজ এর শক্তি অপ্রতিরোধ্য। কিছুদিন আগ পর্যন্তও দাজ্জালের দু'টি প্রধান ভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিলো, আজ নেই, এখন দাজ্জাল নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোন ভূ- ভাগ, মাটি নেই,

কোন সমুদ্র নেই যেখানে এই মহাশক্তি যা ইচ্ছা তা কোরতে না পারে। এই হাদীসটিতে বিশ্বনবী যে উপমা দিয়েছেন তা সত্যই প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে- কোন কিছু দিয়ে (এখানে তিনি চামড়া শব্দ ব্যবহার কোরেছেন) একটা বস্তুকে (এখানে এই পৃথিবীকে) সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলা, পেঁচিয়ে ফেলা। ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার যান্ত্রিক শক্তি যেভাবে সমস্ত পৃথিবীটাকে পদানত কোরে রেখেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী। পৃথিবীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা থেকে বলা যায় যে, **অতীতে কখনও পৃথিবীতে এমন একটি মহাশক্তির আবির্ভাব হয় নি যে শক্তি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত ও নিয়ন্ত্রণ কোরতে পেরেছে।** এটা সম্ভবও ছিলো না। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদি এমন ছিলো না যে অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানের সাথে যোগযোগ করা যায় বা অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে যাওয়া যায়। ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি (Scientific Technology) সেটা সম্ভব কোরেছে। আর কোরেছে বোলেই মানব ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি মহাশক্তিধর দৈত্য- দানবের আবির্ভাব হোয়েছে যেটা সমস্ত পৃথিবীকে পদানত কোরেছে।

এক সময় রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ শাসন কোরতো, অন্য সময় পারসিক শক্তি বিরাট এলাকার অধিপতি ছিলো। তারও আগে বর্ত্তমানের আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বোর্ণিও পর্যন্ত বিশাল এলাকা ভারতীয় সভ্যতার অধীনে ছিলো। কিন্তু কোন একক মহাশক্তিই কখনো সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য কোরতে পারে নি।

তার উম্মতও যে দাজ্জালের পদানত হবে তা এই হাদীসের অর্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। তা যদি না হতো তবে তিনি যেভাবে পৃথিবীতে দাজ্জালের আধিপত্য হবে সেখানে না বোলে বোলতেন- আমার উম্মত তাকে স্বীকার বা অনুসরণ কোরবে না, বা 'আমার উম্মত' না বোলে বোলতেন- মানবজাতির এক পঞ্চমাংশ (মোসলেম জাতি পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ) দাজ্জাল কে স্বীকার কোরবে না। তা তিনি বলেন নি এবং তার অর্থ তাঁর উম্মতও দাজ্জালের অধীন হবে। প্রকৃত অবস্থাও তাই।

চৌদ্দ ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **আরবে এমন কোন স্থান থাকবে না যা দাজ্জালের পদতলে না আসবে বা সেখানে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকবে।** [বোখারী ও মোসলেম]

দাজ্জালের প্রভাব, প্রতিপত্তি যে সমস্ত পৃথিবীময় হবে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীকে সে নেতৃত্ব দেবে এ কথা রসুলাল্লাহ বেশ কয়েকটি হাদীসে বোলেছেন। এবার এই হাদীসটিতে তিনি নির্দিষ্ট কোরে আরবের কথা, তাঁর মাধ্যমে এসলামের যে শেষ সংস্করণটি আল্লাহ যে দেশে পাঠিয়েছিলেন সেই আরব দেশের কথা বোলছেন। তিনি বোলছেন- সেই আরবও দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, তার পদতলে চোলে যাবে। আরবে যদিও আল্লাহর দেয়া আইন- কানুন ও দণ্ডবিধি মোটামুটি চালু আছে, অর্থাৎ ও ব্যাপারে দাজ্জাল কে স্বীকার করে নাই, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে আরবের শাসকরা দাজ্জালের অর্থাৎ পাশ্চাত্য শক্তির কাছে নতজানু হোয়ে তার আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। শুধুমাত্র আইন- কানুন ও দণ্ডবিধি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে আরব

নেতারা পাশ্চাত্যের আদেশ-নির্দেশের অধীন এ কথা যারাই ওদের সম্বন্ধে খবর রাখেন তারাই স্বীকার কোরবেন। কারণও আছে। নেতারা, শাসকরা জানেন যে, মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে গেলে তাদের সিংহাসন, আমীরত্ব থাকবে না। দাজ্জাল তাদের সরিয়ে দিয়ে তার পছন্দমত শাসক নিয়োগ কোরবে। কাজেই বিশ্বনবী বোলেছেন- সমস্ত পৃথিবীতো বটেই, এমনকি সমস্ত আরবও দাজ্জালের পদানত হবে।

পনেরো ॥

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে ও যাবে কিন্তু মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ কোরতে পারবে না। মদীনায় প্রবেশের প্রত্যেক দরজায় দু'জন কোরে মালায়েক (ফেরেশতা) পাহারা দেবে যারা দাজ্জাল কে সেখানে প্রবেশ কোরতে দেবে না।** [আবু বাকরাহ (রাঃ) ও ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) থেকে- বোখারী ও মোসলেম]

আজ সমস্ত পৃথিবীর দিকে একবার তাকালেই বিশ্বনবীর এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিসহ অন্যান্য সমস্ত জাতিগুলি দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতার তৈরী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নীতি ও তার তৈরী আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি গ্রহণ কোরে সেই মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা কোরছে। পৃথিবীতে যে মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো আছে সেগুলোর সরকার ও জনসাধারণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জাল কে রব, প্রভু মেনে নিয়ে তার শেখানো মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ ও প্রয়োগ কোরছে।

কাজেই দাজ্জালের প্রভুত্ব আজ সর্বময়। দাজ্জাল পৃথিবীর সর্বত্র যেতে পারবে অর্থ সমস্ত পৃথিবীটাই তার প্রভুত্বের অধীন হবে। শুধুমাত্র মক্কা ও মদীনায় সে প্রবেশ কোরতে পারবে না। মনে রাখতে হবে রসুলাল্লাহ এক হাদীসে বোলেছেন ('দাজ্জালের পরিচিতি' অধ্যায়ের চৌদ্দ নম্বর হাদীস) সমস্ত আরব দাজ্জালের পদানত হবে আর এই হাদীসে বোলছেন- শুধু মক্কা ও মদীনায় এর ব্যতিক্রম হবে। এর অর্থ হোল মক্কা ও মদীনা এই দু'টি শহর ছাড়া বাকি আরব দেশও দাজ্জালের পদানত হবে। আজ বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হোয়েছে। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর খোদ আরব উপদ্বীপে ইহুদী-খৃষ্টান সামরিক বাহিনী প্রবেশ কোরেছে ও স্থায়ী আসন গেঁড়ে বোসেছে এবং এখন সমগ্র অঞ্চলে ঐ দাজ্জালী সামরিক শক্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু আজও তারা অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টানরা মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ কোরতে পারে নি এবং ইনশাল্লাহ কখনও পারবে না। পারবে না এ কারণে নয় যে মোসলেম নামধারী কিন্তু দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পতিত এই জাতির বাধার কারণে। কারণ বিশ্বনবী তাঁর হাদীসেই বোলে দিয়েছেন- সেটা হোচ্ছে মালায়েকদের দিয়ে পাহারা দেয়া।

ষোল ॥

আল্লাহর রসুল দাজ্জাল কে কখনো কখনো **মাসীহ্ উল- কায্যাব বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন** [আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে মোসলেম]। আবার কখনো কখনো তাকে **মাসীহ উদ্- দাজ্জাল বোলেও বর্ণনা কোরেছেন** [আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম, আবু বাকরাহ (রাঃ) ও ওবাদাহ বিন্ সোয়ামেত (রাঃ) থেকে আবু দাউদ]। **ঐ একই শব্দ 'মাসীহ' রসুলাল্লাহ আল্লাহর অন্য নবী ঈসা (আঃ) সম্বন্ধেও ব্যবহার কোরেছেন** [বোখারী, মোসলেম, তিরমিযি]।

আল্লাহও কোরানে এই মাসীহ শব্দটি কয়েকবার তাঁর নবী ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ব্যবহার কোরেছেন। **একই শব্দ আল্লাহর একজন নবী ও তার ঠিক বিপরীত, আল্লাহকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অপহরণকারী কাফের, উভয়ের ওপর ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ও অসঙ্গত মনে হয় না কি?** দাজ্জাল কে কায্যাব অর্থাৎ মিথ্যাবাদী বলার অর্থ সহজ, সে তো অতি অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কারণ যে মানবজাতিকে বোলবে আমি রব, প্রভু, সে যে বৃহত্তম মিথ্যাবাদী তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, এবং সে যে দাজ্জাল অর্থাৎ চাকচিক্যময়, চোখ-মন ধাঁধানো প্রতারক তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে ও নিজের পূর্ববর্ত্তী নবীকে একই মাসীহ শব্দ প্রয়োগ চিত্তাকর্ষক। এর জবাব পাওয়া যাবে মাসীহ শব্দটির অর্থ পরিষ্কার হোলেই।

'মাসীহ' শব্দের অর্থ হোচ্ছে লেপন করা, আবৃত করা, কোন কিছুর ওপর হাত বুলানো, জড়িয়ে ফেলা, আচ্ছন্ন বা অন্তর্ভুক্ত করা। এই অর্থে এ দৃষ্টিতে ঈসা (আঃ) ও দাজ্জাল দু'জনেই মাসীহ। যদিও ঈসা (আঃ) প্রেরিত হোয়েছিলেন শুধু বনি- এসরাঈলীদের হেদায়াতের জন্য। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার কোরে পল প্রমুখ শিষ্যরা কেমন কোরে তার শিক্ষাকে খৃষ্টান নামে এক ধর্মে রূপান্তরিত কোরে ঐ ধর্ম ইউরোপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কোরলেন ও যার ফলে দাজ্জালের জন্ম হোল তা পেছনে লিখে এসেছি ('দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরত্ব' অধ্যায়ের এক নং হাদীস)। পরবর্ত্তীতে জ্ঞান- বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে মহা শক্তিশালী হোয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খৃষ্টান জাতি ও রাষ্ট্রগুলো তাদের সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীর প্রায় সবটাই দখল কোরে নিলো। তাদের প্রভাবে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার ফলে ও খৃষ্টান প্রচারকদের (M ssi onar y) অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ফলে এ বিজিত পৃথিবীর বহু মানুষ ঐ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ কোরলো। বর্ত্তমানে খৃষ্টানরা পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ, পৃথিবীর এমন স্থান কমই আছে যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় খৃষ্টান নেই। অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম সমস্ত পৃথিবীটাকে লেপন, আবৃত কোরে আছে। বিকৃত হোলেও এই ধর্ম ঈসা (আঃ) থেকেই উদ্ভুত হোয়েছে এবং সমস্ত পৃথিবীকে মাস্হ অর্থাৎ লেপন, আবৃত করার কারণেই তার উপাধি মাসীহ। পক্ষান্তরে সেই ঈসা (আঃ) থেকেই উদ্ভুত ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাও আজ সমস্ত পৃথিবীকে শুধু লেপন ও আবৃত নয়, পদদলিত কোরে আছে। কাজেই এরও উপাধি মাসীহ, লেপনকারী, আচ্ছন্নকারী। দাজ্জাল কে রসুলাল্লাহ মাসীহ উল কায্যাব বোলেও অভিহিত কোরেছেন। কায্যাব শব্দের অর্থ মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল চাকচিক্যময় বিরাট মিথ্যা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত, আচ্ছন্ন কোরে আছে, তাই একে বিশ্বনবী নাম দিয়েছেন মাসীহ উল কায্যাব।

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **ঈসা (আঃ) দাজ্জাল কে হত্যা কোরবেন।** [আব্দুলাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে মোসলেম এবং নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে মোসলেম ও তিরমিযি]

এ সম্বন্ধে হাদীসসমূহে যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো একত্র কোরে সাজালে দেখা যায় এমাম মাহ্দী (আঃ) প্রকাশ হবার পর একদিন আসরের সালাতের ঠিক আগে ঈসা (আঃ) দু'টি মালায়েকের কাঁধে ভর কোরে দামেশকের এক মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারের ওপর এসে নামবেন। তিনি ঘোষণা কোরবেন যে **তিনি দাজ্জাল কে হত্যা কোরতে প্রেরিত হোয়েছেন।** পরে এমাম মাহ্দীর (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের শক্তিগুলোর সঙ্গে যখন মোসলেমদের জেহাদ হবে তখন ঈসা (আঃ) দাজ্জাল কে নিজে হত্যা কোরবেন। রসুলাল্লাহর বর্ণিত ভবিষ্যতের এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে সহিহ হাদীসগুলি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দেয়। দাজ্জাল কে হত্যার করার জন্য দুই হাজার বছর আগের একজন নবীকে নির্দিষ্ট করার কারণ কি? দুই হাজার বছর আগে একজন নবীকে আল্লাহ সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে তাঁকে বোসিয়ে রেখে দিলেন। তারপর হাজার হাজার বছর পরে [ঈসা (আঃ) কবে আসবেন আমরা জানি না, তবে ইতোমধ্যেই দুই হাজার বছর পার হোয়ে গেছে।] তাঁকে সশরীরে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে দাজ্জাল কে ধ্বংস করার জন্য। কেন? আল্লাহ কি দাজ্জালের সমসাময়িক এমাম মাহ্দীকে (আঃ) দিয়ে বা অন্য যে কোন লোক দিয়ে দাজ্জাল কে হত্যা করাতে পারবেন না? বা তাঁর কি আর মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা শেষ হোয়ে যাবে? (নাউযুবিল্লাহ মিন- যালেক)। আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত যিনি অসংখ্য মানুষ সৃষ্টি কোরেছেন ও কোরবেন তাঁর জন্য দাজ্জাল কে হত্যা করার জন্য আর একটিমাত্র মানুষ সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ ছিলো? এক ইদরিস্ (আঃ) ছাড়া আর কোন মানুষ সশরীরে আসমানে যেতে পারেন নি এবং ইদরিস্ (আঃ) আর কখনও পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না, অথচ একমাত্র ঈসাকে (আঃ) সশরীরে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে দাজ্জাল কে হত্যা করার জন্য। আল্লাহর এই ব্যতিক্রমধর্মী অদ্ভুত কাজের কারণ কি?

কারণ আছে। এ কথা সন্দেহাতীত এবং কেউ অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে, **দু'হাজার বছর আগের ঈসার (আঃ) সঙ্গে অন্ততপক্ষে দু' হাজার বছর পরের (বেশীও হোতে পারে) দাজ্জালের এক ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক আছে।** তা না থাকলে, আর কেউ নয়, অন্য কোন নবীও নয়, এমাম মাহ্দীও (আঃ) নয়, শুধু ঈসাকেই (আঃ) নির্দিষ্ট কোরে আসমানে রেখে দেয়া হোয়েছে কেন দাজ্জাল কে হত্যা বা ধ্বংস করার জন্য, যে দাজ্জাল ঈসার (আঃ) জীবনের হাজার হাজার বছর পর জন্ম নেবে?

যদি আমরা দাজ্জাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে (আকীদা) স্বীকার কোরে নেই- অর্থাৎ দাজ্জাল শারীরিকভাবে পৃথিবীর মত বিরাট ঘোড়ায় আসীন এক চক্ষু বিশিষ্ট একটা দানব দৈত্য হবে, তবে প্রশ্ন এই যে, তাকে হত্যা করার জন্য হাজার হাজার বছর আগের একজন বিশেষ, নির্দিষ্ট নবীকে অতীত থেকে ভবিষ্যতে ফিরে আসতে হবে কেন? এ প্রশ্নের সহজ জবাব মিলে যাবে যদি আমরা বর্ত্তমানের ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাকে দাজ্জাল বোলে চিহ্নিত কোরি। **প্রকৃতপক্ষে এটাই হোচ্ছে এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এবং এ উত্তর ছাড়া আর কোন উত্তরের যথার্থতা নেই।**

ঈসা (আঃ) ধর্মে ছিলেন মো'মেন ও মোসলেম, অন্যান্য সব নবীর মতই, এবং জাতিতে ছিলেন বনি- এসরাঈল, ইহুদী। তাঁর জাতির বিকৃত দীনকে সংস্কার করার চেষ্টা বিফল হবার

ফলে তাঁর শিষ্যরা বিপথগামী হোয়ে যে জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতার মহাশক্তিশালী দানব সৃষ্টি কোরলো, যে দানব স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার কোরে নিজেকে রব, প্রভু হবার দাবী কোরলো এবং মানবজাতিকে দিয়ে তা স্বীকার করালো, সে দানবকে হত্যা, ধ্বংস করার দায়িত্ব আর কারো নয়, শুধু ঈসারই (আঃ)। ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর নবী বোলে অস্বীকার কোরে জুডাই ধর্মের আলেমরা অর্থাৎ রাব্বাই, সাদ্দুসাই এবং ফারিসীরা যখন তাদের শাসক রোমানদের দিয়ে তাঁকে ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা করার চেষ্টা কোরলো তখন আল্লাহ তাঁর নবীকে মালায়েক দিয়ে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য মাত্র তিরিশটি মুদ্রার জন্য তাঁকে আলেম ও রোমানদের হাতে ধোরিয়ে দিয়েছিলো সেই জুডাস ইস্কারিয়াসের চেহারা ও আকৃতি অবিকল ঈসার (আঃ) মতো কোরে দিলেন। ইহুদী ধর্মের আলেমরা ও রোমানরা তাকেই ঈসা (আঃ) মনে কোরে ক্রুশে উঠিয়ে হত্যা কোরলো। এমন হোতে পারে যে, আসমানে উঠিয়ে নেবার পর আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) ভবিষ্যতে তাঁর উম্মাহর কাজের ফলে যে দাজ্জালের জন্ম হবে তা দেখিয়ে দিলেন, যা দেখে ঈসা (আঃ) আল্লাহকে বোললেন- ইয়া আল্লাহ! আমার উম্মতের কাজের ফলের জন্য আমিও অন্তত আংশিকভাবে দায়ী। কাজেই আমার উম্মতের সৃষ্ট দানবকে ধ্বংস করার দায়িত্ব আমাকেই দাও। অথবা এমনও হোতে পারে যে, আল্লাহই ঈসাকে (আঃ) বোললেন- ঈসা! দ্যাখো, তোমরা উম্মতের ভুলের, বিপথগামীতার ফলে কেমন মহাশক্তিধর দানব সৃষ্টি হোয়েছে যে আমার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে নিজেকে রব, প্রভু বোলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরেছে এবং আমার শেষ নবীর উম্মতসহ মানবজাতি তাকে রব বোলে মেনে নিয়েছে। যেহেতু তোমার উম্মত থেকেই এই কাফের দানবের জন্ম, কাজেই তোমাকেই আমি দায়িত্ব দিচ্ছি একে ধ্বংস করার জন্য। দাজ্জাল কে হত্যা বা ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে আসমান থেকে হাজার হাজার বছরের অতীতের একজন নির্দিষ্ট নবীকে পৃথিবীতে পাঠাবার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। যদি কেউ অন্য কারণ বের কোরতে পারেন তবে তা প্রকাশ কোরলে আমার ভুল সংশোধন কোরবো।

এ পর্যন্ত যে হাদীসগুলি পেশ কোরলাম সবগুলিতেই রসুলাল্লাহ দাজ্জাল কে সরাসরি উল্লেখ কোরেছেন। এবার কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন কোরছি যেগুলিতে মহানবী দাজ্জাল শব্দটি ব্যবহার না কোরেও ঐ দাজ্জাল কেই বুঝিয়েছেন। পেছনে আমি প্রমাণ কোরে এসেছি যে মোসলেম, মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী হবার দাবীদার এই জাতিটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ কয়েকশ' বছর থেকে দাজ্জাল কে অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতাকে প্রভু, রব বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে, শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উপাসনা, এবাদত ছাড়া আর সর্ববিষয়ে তার অনুসরণ ও অনুকরণ কোরছে। এমন কি এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যক্তিজীবনেও ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতার নকল করার প্রাণান্ত প্রয়াস কোরছে। এরই ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন বিশ্বনবী এই হাদীসগুলিতে।

ক) আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **তোমরা** (ভবিষ্যতে) **তোমাদের পূর্ববর্ত্তীদের অনুসরণ, অনুকরণ কোরবে, এমন কি তারা যদি সরীসৃপের গর্ত্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাই কোরবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হোল- হে আল্লাহর রসুল-** (যাদের অনুসরণ করা হবে) **তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? তিনি জবাব দিলেন- আর কারা** (হাদীস- আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে- বোখারী, মোসলেম, মেশকাত) ?

খ) আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **নিশ্চয়ই এমন সময় আসছে যখন বনি এসরাঈলীদের এমন পদে পদে অনুকরণ করা হবে যে তাদের কেউ যদি তার মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তবে**

আমার উম্মাহর মধ্য হোতেও কেউ তাই কোরবে (হাদীস- আব্দুলাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে- বোখারী, মোসলেম, মেশকাত)। এই হাদীসটিতে বিশ্বনবী শুধু বনি- এসরাঈল উল্লেখ কোরেছেন, খৃষ্টান উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আমি পেছনে দেখিয়ে এসেছি ('দাজ্জালের আবির্ভাবের গুরুত্ব' অধ্যায়ের এক নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা) আসলে ইহুদী বোলতে ইহুদী খৃষ্টান উভয়কেই বোঝায় এবং সে জন্য বিভিন্ন হাদীসেও আল্লাহর রসুল শুধু ইহুদী বোলে উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এই দুইটি হাদীসেও দাজ্জাল শব্দ উল্লেখ না কোরেও বিশ্বনবী নিঃসন্দেহে দাজ্জাল কেই বুঝিয়েছেন।

দাজ্জাল সম্বন্ধে অন্যান্য হাদীস

বইয়ের প্রথম দিকে লিখে এসেছি যে হাদীসসমূহের সত্যতা যাচাইয়ের কঠিন প্রক্রিয়ায় এসনাদের অভাবে বা ত্রুটিতে অনেক সহিহ অর্থাৎ সত্য হাদীসও পরিত্যক্ত হোয়েছে, বাদ পোড়ে গেছে। দাজ্জাল সম্বন্ধেও কতকগুলো হাদীস আছে যেগুলো এসনাদের অভাবে সহিহ পর্যায়ে নেয়া হয়নি- কিন্তু ওগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে ওগুলো সহিহ, কারণ সহিহ হাদীসগুলোর সঙ্গে ওগুলো শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ সম্পূরক। এর মধ্য থেকে একটি হাদীস পেছনে উল্লেখ কোরে এসেছি যেটায় বলা হোয়েছে- দাজ্জালের ঘোড়ার অর্থাৎ বাহনের এক পা থাকবে (পৃথিবীর) পূর্ব (মাশরেক) প্রান্তে, অন্য পা থাকবে পশ্চিম (মাগরেব) প্রান্তে। এখন অন্য দু'একটি হাদীস উল্লেখ কোরবো।

পেছনে Leopold Weiss অর্থাৎ মোহাম্মদ আসাদের কথা লিখেছি। প্রকৃতপক্ষে তার Road to Mecca বইয়ে দাজ্জাল সম্বন্ধে তার অভিমতই আমাকে এই বিষয়ে চিন্তার প্রেরণা দেয়। তার আগে আমিও অন্যের মত দাজ্জাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, আকীদাই পোষণ কোরতাম- অর্থাৎ বিরাট ঘোড়ার ওপর উপবিষ্ট এক চক্ষুওয়ালা এক দানব- পৃথিবীর মানুষকে বোলছে- আমি তোমাদের রব, প্রভু! আর পৃথিবীর সব মানুষ তাকে রব বোলে মেনে নিয়ে তাকে সাজদা কোরছে। **দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে দাজ্জালের দেয়া রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের তৈরী করা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ কোরছে।** তার বইটিতে মোহাম্মদ আসাদ দাজ্জাল সম্বন্ধে যে কয়টি হাদীস বোললেন তার মধ্যে শুধু একটি বাদে সবগুলো সহিহ। ঐ একটি হোচ্ছে এই- **পৃথিবীর অপর প্রান্তে(অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র) কি কথা হোচ্ছে দাজ্জাল তা শুনতে পাবে এবং পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি হোচ্ছে তা দেখতে পাবে।**

এই হাদীসটির অর্থ যে রেডিও ও টেলিভিশন তা তো আহাম্মকও বুঝবে এবং ও দু'টি যে ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার দান তাও সবারই জানা। মোহাম্মদ আসাদ এই হাদীসটি বোলেছিলেন মক্কার তখনকার শ্রেষ্ঠ আলেম ও শায়েখ আবদুলাহ ইবনে বুলাইদিদের সামনে যিনি তদানীন্তন বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে সউদকে ধর্ম বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন। যেহেতু সেই শায়েখ ঐ হাদীসের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুললেন না, বরং আসাদের মতেরই সমর্থন কোরলেন সেহেতু আমরা ধোরে নিতে পারি যে ঐ হাদীস সঠিক। দ্বিতীয়ত, এটা অন্যান্য সমস্ত সহিহ হাদীসের সমার্থক ও সম্পূরক। মহানবীর এই হাদীসটি আরও একটি বিষয় পরিষ্কার কোরে দিচ্ছে। যারা হাদীসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ কোরে দাজ্জাল কে একটি দানব বা দৈত্য হিসেবে নিচ্ছেন তাদের মতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কথা দাজ্জাল একাই শুনতে ও দেখতে পাবে। কিন্তু বেতার ও টেলিভিশন কি আজ শুধু একজন শুনতে ও দেখতে পায়? অবশ্যই নয়। অর্থাৎ **দাজ্জাল একটা মাত্র ব্যক্তি বা জিনিস (Unit) নয়, দাজ্জাল হোচ্ছে ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার মহাশক্তিশালী বিরাট একচক্ষু দানব ও তার অনুসারীরা।**

আরও একটি চিত্তাকর্ষক হাদীস পাঠকদের সামনে পেশ কোরছি। এটারও সনদ আমার জানা নেই। অনেক দিন আগে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শুনেছিলাম। তখন দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন আগ্রহও ছিলো না, দাজ্জালের ঘটনা ও আবির্ভাব যে এত গুরুত্বপূর্ণ তাও জানতাম না। কাজেই যিনি এ হাদীসটি আমায় বোলেছিলেন তাকে হাদীসের সনদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কোরি নি।

তাকে আজ আর মনেও নেই। তবে হাদীসটি ভুলি নি, মনে আছে। হাদীসটি এই- দাজ্জাল সম্বন্ধে বলার সময় আল্লাহর রসুল যখন দাজ্জাল খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে বোললেন তখন কোন কোন সাহাবা তাঁকে প্রশ্ন কোরলেন, কেমন দ্রুত সে গতি হবে? তখন বিশ্বনবী বোললেন- **জুম্মার সালাহ কায়েম কোরতে যে সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে দাজ্জাল সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে।**

আমরা জানি যে, ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা আকাশে যে উপগ্রহগুলো (Satellite) চালু কোরেছে সেগুলোর গতি ঘণ্টায় কমবেশী ১৮, ০০০ (আঠারো হাজার) মাইল। এই গতিতে পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে আসতে এই উপগ্রহগুলোর সময় লাগছে ৯০ থেকে ৯৫ মিনিট। এই নির্দিষ্ট গতির কারণ আছে। উপগ্রহসহ যে কোন বস্তুর গতি যদি ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইলের চেয়ে কম হয় তবে তা শূন্যে থাকতে পারবে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের (Gravity) টানে তা পৃথিবীর বুকে পোড়ে যাবে। আবার উপগ্রহগুলোর গতি যদি ঘণ্টায় ২৪, ০০০ (চব্বিশ হাজার) মাইলের বেশী হয় তবে ওগুলো মাধ্যাকর্ষণের টেনে রাখার শক্তিকে পরাজিত কোরে মহাশূন্যে চোলে যাবে, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে না। এই জন্য ঘণ্টায় ২৪, ০০০ মাইলের বেশী গতির বৈজ্ঞানিক নাম হোচ্ছে Escape Velocity অর্থাৎ যে Velocity বা গতি লাভ কোরলে কোন বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে বাইরে, মহাকাশে চোলে যেতে পারে। কাজেই উপগ্রহগুলোকে পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে (Orbit) ধোরে রাখার জন্য ওগুলোর গতি ঘণ্টায় ১৮, ০০০ মাইল রাখতে হোয়েছে। এই উপগ্রহগুলো শুধু যে যন্ত্র তাই নয়, ওর মধ্যে মানুষও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অবস্থান কোরছে। যেসব রকেট মহাশূন্যে পাঠানো হোচ্ছে সেগুলির গতি ঘণ্টায় ২৪, ০০০ মাইলের বেশী করা হোচ্ছে।

আল্লাহর রসুলের সময় ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাব ছিলো না। কাজেই দাজ্জালের পৃথিবীর ঘুরে আসার সময়টা তাঁকে বোলতে হোয়েছে অন্য কোন কাজের সময়ের উদাহরণ দিয়ে, এবং সেটা তিনি দিয়েছেন সবচেয়ে প্রযোজ্য উদাহরণ, জুম্মার নামাযের সময় দিয়ে। জুম্মার নামাযের প্রস্তুতি অর্থাৎ গোসল করা, কাপড়- চোপড় পরা, মসজিদে যাওয়া, খোত্‌বা শোনাসহ নামায পড়া, পরিচিতদের সঙ্গে দু'চারটি কথা বলা ও বাড়ীতে ফিরে আসা। সব মিলিয়ে মোটামুটি ৯০ থেকে ৯৫ মিনিটের মতই সময় লাগে। অনেকে বোলতে পারেন ও সব কিছু সত্ত্বেও জুম্মার নামাযে ৯০/৯৫ মিনিট সময় লাগে না। এ কথাটিও ঠিক। বর্ত্তমানের বিকৃত, আল্লাহর- সুলের প্রদর্শিত দিক- নির্দেশনার বিপরীতমুখী, দাজ্জালের পায়ে সাজদায় অবনত 'মোসলেম'দের জুম্মায় সময় কম লাগে। কারণ এখন জুম্মা অর্থ খোত্‌বা শোনা (যে খোত্‌বার কোন অর্থই এরা বোঝেন না) ও দু'রাকাত নামায পড়া। কিন্তু রসুলাল্লাহর সময় মসজিদ ছিলো তার উম্মাহর সমস্ত রকমের কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। কাজেই জুম্মায় এখনকার চেয়ে সময় বেশী লাগতো। যেহেতু উপগ্রহ ও মহাকাশচারী রকেটগুলো ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভাবন সুতরাং নিঃসন্দেহে এই সভ্যতাই দাজ্জাল ।

এ হাদীসগুলির ব্যাখ্যা থেকে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে আল্লাহর রসুল কর্ত্তৃক বর্ণিত আখেরী যমানার দাজ্জাল কোন দৃশ্যমান (Visible) বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদের বোঝাবার জন্য এটি একটি রূপক (Allegorical) বর্ণনা যে কথা পেছনে বোলে এসেছি। এর পরও যদি কেউ জোর কোরে বোলতে চান যে, না, এক চক্ষুবিশিষ্ট, বিরাটকায়, জ্বলজ্যান্ত একটি অশ্বারোহী দানবই আসবে, তাহোলে আমার বক্তব্য

হোচ্ছে, ধরুন আপনার কথামত এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হোল, তার বাহন ঘোড়া বা গাধার দুই কানের ব্যবধানই সত্তর অর্থাৎ বহু সহস্র হাত (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১ নং হাদীস), তাহোলে কি কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত সেই দাজ্জাল ? **চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়োতনের এক দানবকে দেখে প্রথমেই সকলের মনে প্রশ্ন আসবে, এই বিরাট দানব আসলো কোত্থেকে! তাকে দেখে কেবল মোসলেমরাই নয়, অমোসলেমরাও এক মুহূর্ত্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো এসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল । সকল মানুষেরই তখন আমাদের নবীর উপর এবং এসলামের উপর ঈমান এসে যাবে।**

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রসুল বোলেছেন, দাজ্জাল ইহুদী জাতি থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার (অসংখ্য) লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ৩ নং হাদীস)। দাজ্জাল যদি রসুলের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যিই জ্যান্ত কোন দানবীয় প্রাণী হয় তাহোলে কি কোরে এমন দানব মানব সমপ্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইহুদী জাতির মধ্য থেকে আসতে পারে? আর মোসলেমরাই কি কোরে আল্লাহকে ছেড়ে একটি দানবকে অনুসরণ কোরতে পারে?

তৃতীয়ত, আল্লাহর রসুল বোলেছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে (অর্থাৎ কপালে) কাফের লেখা থাকবে। শুধু মো'মেন, বিশ্বাসীরাই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে; যারা মো'মেন নয়, তারা পড়তে পারবে না (দেখুন দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১১ নং হাদীস)। অর্থাৎ কিছু লোক (মো'মেন) দাজ্জাল কে কাফের বোলে বুঝতে পারবে আর কিছু লোক (যারা মোমেন নয়) দাজ্জাল যে কাফের তা বুঝতে পারবে না, এবং বুঝতে পারবে না বোলেই বহু সংখ্যক লোক তাকে রব বোলে মেনে নেবে। দাজ্জাল যদি শরীরী কোন দানবই হয় তাহোলে সবাই তাকে প্রথম দর্শনেই দাজ্জাল বোলে চেনার কথা। তারপরও সে কাফের কি কাফের নয় এ নিয়ে মানুষের মধ্যে দ্বিমত হওয়া সম্ভব? ধরুণ কোন লোকালয়ে বা জনবহুল স্থানে হঠাৎ একটি বাঘ এসে পড়লো; সেখানের অবস্থাটা কি হবে ভাবুন। ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারবে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা কোরবে, তাই নয় কি? অথচ অকল্পনীয় বিরাট, ভয়ঙ্কর একটি দানব, যার বাহনের এক পা পৃথিবীর এক প্রান্তে আরেক পা পৃথিবীর অপর প্রান্তে, তাকে সামনা সামনি দেখেও কেউ চিনবে- কেউ চিনবে না, কেউ তাকে অনুসরণ কোরবে- কেউ কোরবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে- কেউ পারবে না এ কি হোতে পারে?

তাহোলে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোন শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হোচ্ছে বর্ত্তমান দুনিয়ার ইহুদী- খ্রীস্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা।

বাইবেলে দাজ্জাল

বাইবেলের নতুন নিয়মে (New Testament) ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে, পৃথিবীর শেষ সময়ে (Last hour) Anti-Christ আবির্ভূত হবে। Anti-Christ- এর শাব্দিক অনুবাদ হোচ্ছে খৃষ্ট-বিরোধী। **আমি মনে কোরি এই Anti-Christ-ই বিশ্বনবী বর্ণিত দাজ্জাল ।** অবশ্য দাজ্জাল শব্দের অর্থ যেমন বর্ত্তমানের ইহুদী-খৃষ্টান জড়বাদী যান্ত্রিক সভ্যতাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে Anti-Christ শব্দটা ততটা করে না। দাজ্জাল শব্দের অর্থ হোচ্ছে এমন একটি জিনিস যা এমন চাকচিক্যময় যে তা মানুষের মন মগজকে বিমোহিত কোরে ফেলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ প্রতারক, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার নিখুঁত বর্ণনা। এই আত্মাহীন সভ্যতার যান্ত্রিক প্রযুক্তির উৎপাদিত বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তু মানুষের মনকে ধাঁধিয়ে ফেলে, কিন্তু ভেতরে আত্মা নেই বোলে এর অনুসারীদের মানবেতর জীবে পরিণত করে।

বাইবেলের চার জায়গায় Anti-Christ (খৃষ্ট-বিরোধী বা জিশু-শত্রু) এর উল্লেখ আছে। আমি একটা একটা কোরে ওগুলোর উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর রসুল বর্ণিত দাজ্জালের সাথে বাইবেল বর্ণিত Anti-Christ-এর সাদৃশ্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই উদ্ধৃতিগুলো দিচ্ছি New World Testament of the Holy Scriptures থেকে। Authorised of King James Version-এর সঙ্গে এর ভাষার কিছু পার্থক্য ছাড়া মূল বক্তব্যে কোন অমিল নেই।

1. Young children, **it is the last hour,** and, just as you have heard that Anti-Christ is coming even now there have come to be many Anti-Christs; from which fact we gain the knowledge that is **the last hour** (Acts: 1 Jo: 18) .

অর্থাৎ- তরুণ সন্তানগণ! এখন **পৃথিবীর শেষ সময়** এবং তোমরা শুনেছো যে খৃষ্ট-বিরোধী (জিশু-শত্রু) আসছে; ইতোমধ্যেই অনেক জিশু বিরোধী এসে গেছে যা থেকে আমরা জানতে পারছি যে **এটাই শেষ সময়** (আখেরী যমানা)।

বিশ্বনবীর বর্ণিত দাজ্জালের সঙ্গে এখানে দু'টি মিল পাচ্ছি। একটি দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় অর্থাৎ আখেরী যমানা (Last hour) দ্বিতীয়টি বিশ্বনবী নির্দিষ্ট দাজ্জাল কে ছাড়াও অন্যান্য যালেম, প্রতারক, মিথ্যাবাদীকে কখনো কখনো দাজ্জাল বোলে অভিহিত কোরেছেন। যদিও আখেরী যমানার নির্দিষ্ট দাজ্জালের কথাও ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন। বাইবেলে একাধিক Anti-Christ ইতোমধ্যেই এসে গেছে বলা হোয়েছে।

2. Who is **the liar** if it is not the one that **denies** that Jesus is the Chirst? This is the **Anti-Christ,** the one that **denies** the Father and the Son (Acts: 1 Jo 2: 22) .

অর্থাৎ- যে জিশুকে খৃষ্ট বোলে **অস্বীকার** করে সে যদি **মিথ্যাবাদী** না হয় হবে মিথ্যাবাদী আর কে? সেই হোচ্ছে **খৃষ্ট-বিরোধী** (জিশু-শত্রু) Anti-Christ যে পিতা (Father) এবং পুত্রকে (Son) **অস্বীকার করে।**

বিশ্বনবী দাজ্জাল কে মিথ্যাবাদী বোলে বর্ণনা কোরেছেন এখানে বাইবেলে Anti-Christ সম্বন্ধে ঠিক সেই শব্দ ব্যবহার করা হোয়েছে- **liar, মিথ্যাবাদী**। বাইবেলে Anti-Christ কে মিথ্যাবাদী বলা হোয়েছে এই জন্য যে সে পিতা (God) ও পুত্রকে (Jesus) **অস্বীকার** কোরবে।

মনে রাখতে হবে খৃষ্টানরা তাদের বিকৃত আকীদায় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর ছেলে এবং উভয়কে একই সত্তা বোলে মনে করে। অর্থাৎ বাইবেলের কথায় বলা হোচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার কোরবে। মহানবী বোলেছেন দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব বোলে ঘোষণা কোরবে ও মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিতে- অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার কোরতে।

3. Every inspired expression that confesses Jesus Christ as having come in the flesh originates with God, but every inspired expression that does not confess Jesus does not originate with God. Furthermore, this is the Anti-Christ's (inspired expression) **which you have heard was coming,** and now it is already in the world (Acts: 1 Jo 4:2, 3) .

অর্থাৎ- প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা স্বীকার করে যে জিশুখৃষ্ট রক্ত-মাংসে আবির্ভূত হোয়েছেন সেটা ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে, কিন্তু প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি যেটা জিশুকে স্বীকার করেন না সেটা, ঈশ্বরের নিকট থেকে আসে নাই। অধিকন্তু, সেটাই হোচ্ছে জিশু বিরোধীর, Anti-Christ (প্রত্যাদিষ্ট অভিব্যক্তি) **ভবিষ্যতে যার আগমন সম্বন্ধে তোমরা শুনেছো,** এবং সে ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে গেছে।

বাইবেলের এই কথাগুলিতেও আমরা পাচ্ছি যে Anti-Christ ভবিষ্যতে আবির্ভূত হবে **(which you have heard was coming)** এবং সে জিশুকে অস্বীকার কোরবে। মহানবীর কথারই পুনরাবৃত্তি।

4. For many **deceivers** have gone forth in the world, persons not confessing Jesus Christ as coming in the flesh. This is the **deceiver** and the **Anti-Christ** (Acts: 2 Jo-7) .

অর্থাৎ- অনেক **প্রতারক** পৃথিবীতে এসেছে জিশুখৃষ্ট রক্ত মাংসে আবির্ভূত হোয়েছেন এ কথা যারা স্বীকার করেন নাই। এরাই হোচ্ছে **প্রতারক, জিশু বিরোধী (Anti-Christ)**।

বাইবেলের এই কথাগুলো বিবেচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর কেতাব বাইবেল (এনজিল) আর সে প্রকৃত বাইবেল নেই। মুসা (আঃ) যে হিব্রু ভাষায় কথা বোলেছেন সে ভাষাই নেই, বাইবেলও সে ভাষায় নেই। ঈসা (আঃ) যে এ্যারামাইক ভাষায় কথা বোলতেন, সেই এ্যারামাইক ভাষায় লিখিত বাইবেল (এনজিল) পৃথিবীর কোথাও নেই (গত শতাব্দিতে Gospel of Barnabas অর্থাৎ ঈসার (আঃ) ঘনিষ্ঠ সাহাবী বার্নাবাসের লিখিত বাইবেলটি তার কবর থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে, তবে খৃষ্টান পুরোহিত সমাজ সেটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি কারণ এ বাইবেলটিতে ঈসার (আঃ) বক্তব্য মোটামুটি অবিকৃত অবস্থায় আছে, ফলে তা প্রচলিত বাইবেলগুলির সাথে বুনিয়াদি বিষয়গুলিতে সাংঘর্ষিক)। আদি বাইবেল প্রথমে গ্রীক ও পরে ল্যাটিন (রোমান) ও পরে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হোয়ে অন্যরূপ ধারণ কোরেছে। বাইবেলের আদি একেশ্বরবাদ (তওহীদ) বিকৃত হোয়ে ত্রিত্ববাদে পরিণত হোয়েছে যেমন

এবরাহীম (আঃ) তওহীদ ভিত্তিক মিল্লাতে এবরাহীম অর্থাৎ দীনে হানীফ ক্রমে বিকৃত হোয়ে আরবের পৌত্তলিকতায় পরিণত হোয়েছিলো। কাজেই Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জাল সম্বন্ধে বাইবেলের ভাষাও অবশ্যই বদলে গেছে। এতকিছু সত্ত্বেও বহু অনূদিত, বিকৃত বাইবেলেও চারবার উল্লেখ করা Anti-Christ সম্বন্ধে যে কয়টি বিষয় বলা হোয়েছে তার মধ্যে দাজ্জাল সম্বন্ধে বিশ্বনবীর বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ক) আল্লাহর রসুল বোলেছেন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে **আখেরী যমানায়।** বাইবেল বোলছে Anti-Christ-এর আবির্ভাব হবে last hour-এ, অর্থাৎ আখেরী যমানায় (Acts: 1 Jo. 2:18, 4:3)।

খ) মহানবী বোলেছেন দাজ্জাল আল্লাহকে অস্বীকার কোরে নিজে রব হবার দাবী কোরবে। বাইবেল বোলছে Anti-Christ পিতা (Father, God) ও পুত্রকে (Son, Jesus) অস্বীকার কোরবে (Acts: 1 Jo. 2:22, 4:3, 2 Jo 7)

গ) বিশ্বনবী দাজ্জাল কে **প্রতারক** বোলেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে Deceiver (প্রতারক) বোলছে (Acts 2 Jo 7)।

ঘ) আল্লাহর নবী দাজ্জাল কে **মিথ্যাবাদী** (কায্যাব) বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন। বাইবেলও Anti-Christ কে **Liar** (মিথ্যাবাদী) বোলছে (Acts: 1 Jo 2:22)।

এটি একটি বিরল ও নিষ্ঠুর পরিহাস যে, যে খৃষ্টানরা (যদিও তখনও তারা সম্পূর্ণ হয় নি, আংশিকভাবে জুডাই অর্থাৎ ইহুদী ধর্মেই আছে) বাইবেলে যে Anti-Christ-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোরছেন এবং মানুষকে সে সম্বন্ধে সাবধান কোরে দিচ্ছেন, অথচ জানেন না তাদেরই কাজের ফলে Anti-Christ অর্থাৎ দাজ্জালের জন্ম হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাই হবে Anti-Christ এর প্রথম সারির অনুসারী।

কিন্তু. . . . .

দাজ্জাল ও বর্ত্তমান ইহুদী- খৃষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা একই বস্তু ও যান্ত্রিক শক্তিই এর বাহন কিন্তু তাই বোলে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক প্রযুক্তিটাই খারাপ বা বর্জনীয়, এই বই পড়ে এ ধারণা যেন কারো মনে না আসে। কোন জিনিস ভালো কি মন্দ তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই জিনিসের ব্যবহারের ওপর। একটা অস্ত্র দিয়ে ডাকাতি বা খুন করা যায়, সেই অস্ত্র দিয়েই আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা যায়, খুনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরে অসহায়কে রক্ষা করা যায়। অস্ত্র নিজে দায়ী নয়, যে সেটাকে ব্যবহার কোরবে দায়ী সে। দাজ্জাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার কোরছে অন্যায়ভাবে। চিকিৎসা, কৃষি, আবহাওয়া ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে ঐ প্রযুক্তি ব্যবহার কোরলেও তার প্রধান অংশই ব্যবহৃত হোচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে। এ কথা প্রমাণ করার দরকার করে না, পাশ্চাত্য সভ্যতার সরকারগুলির সামরিক খাতে ব্যয়ের সাথে অন্যান্য খাতে ব্যয়ের একটি তুলনাই এ কথা পরিষ্কার কোরে দেবে। সামরিক খাতে ঐ ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হোচ্ছে বাকি পৃথিবীকে পদানত কোরে রাখা। তেমনিভাবে দাজ্জালের সৃষ্ট রেডিও টেলিভিশন মানুষকে ভালো অনেক কিছু শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা, সহিংসতা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ, নগ্ন যৌনতা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে তাকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছে।

আল্লাহ যে বিরাট, বিশাল বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কোরেছেন তা তিনি বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি কোরেই কোরেছেন। আদম (আঃ) কে সৃষ্টি কোরে তিনি তাকে সব জিনিসের নাম শেখালেন (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩১)। সব জিনিসের নাম শেখানোর অর্থ কি? এর অর্থ হোচ্ছে কোন্ জিনিসের কি কাজ, কোন্ জিনিস দিয়ে কি কাজ হয় তা শেখানো, এক কথায় বিজ্ঞান, কারণ সমস্ত সৃষ্টিটাই বৈজ্ঞানিক। আর আদমকে (আঃ) শেখালেন অর্থ মানুষ জাতিকে শেখালেন। কোরানের এই আয়াত এই অর্থ বহন করে যে, **মানুষ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে এই বৈজ্ঞানিক মহাসৃষ্টির অনেক তথ্য, অনেক রহস্য জানতে পারবে।** মানুষ জাতির বিজ্ঞানীরা গবেষণা কোরে আবিষ্কার কোরছেন আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিস দিয়ে কী হয়, আর তা প্রযুক্তিতে ব্যবহার কোরছেন। আল্লাহ তাঁর কোরানে তাঁর বিরাট সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাববার, গবেষণা করার জন্য বারবার বোলেছেন, **বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নফল এবাদতের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন।**

আল্লাহর ঐ আদেশ অনুযায়ী কাজ করার ফলে এই মোসলেম জাতিতে অতীতে বিরাট বিরাট জ্ঞানী, বিজ্ঞানীর জন্ম হোয়েছে, যাদের কাজের ওপর, গবেষণার ফলের ওপর ভিত্তি কোরে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সম্ভব হোয়েছে। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মোসলেম বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বিজ্ঞানে, চিকিৎসায়, দর্শনে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, রসায়নে, এক কথায় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিরাট অগ্রগতি করার পর আকীদার বিকৃতিতে জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে, অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অমান্য কোরে এই জাতি যখন ফতোয়াবাজী শুরু কোরলো তখন স্বভাবতঃই সেটা অজ্ঞানতার ও অশিক্ষা- কুশিক্ষার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হোল। আর তাদের কাজের, গবেষণার পরিত্যক্ত ভিত্তির ওপর অগ্রগতি কোরে দাজ্জাল তার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির বিশাল ইমারত গড়ে তুললো। পদার্থ বিজ্ঞানে ইবনে হাইসাম, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনা, আল নাফীস, আল রাজী, অংক শাস্ত্রে আল খাওয়ারিযমী, আলকিন্দী, আল ফরগানী, সাধারণ বিজ্ঞানে ওমর খাইয়াম, বিবর্ত্তনবাদে ইবনে খালদুন প্রমুখ মনীষীরা বিজ্ঞানে প্রতি অঙ্গনে গবেষণা কোরে যে ভিত্তি স্থাপন কোরেছিলেন, আজ দাজ্জালের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির শক্তি তারই

ফল। **দাজ্জাল অন্যায় ও অপব্যবহার কোরছে বোলেই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও যন্ত্র বর্জনীয় হোতে পারে না- বর্জনীয় হোচ্ছে ওর অপব্যবহার।**

যেহেতু আল্লাহ তাঁর খলীফা আদমকে (আঃ) নিজ হাতে সৃষ্টি কোরে তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান শেখালেন, সেহেতু মনে রাখতে হবে যে **জ্ঞান- বিজ্ঞান কোন বিশেষ জাতির বা বিশেষ সভ্যতার সম্পদ নয়।** সৃষ্টির পর থেকেই মানবজাতি এই জ্ঞান- বিজ্ঞানে প্রগতি কোরে আসছে। অতীতে যারা জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা কোরে ভিত্তি স্থাপন কোরে গেছেন তাদের সেই ভিত্তির ওপর বর্ত্তমানের গবেষক, বিজ্ঞানীরা নতুন জ্ঞান- বিজ্ঞান যোগ কোরছেন এবং আজকের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলকে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা আরও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এতে কোন জাতির, কোন সভ্যতার মালিকানা নেই, এর মালিকানা সমগ্র মানবজাতির। **বীজগণিত** (Algebra) **আল খাওয়ারিযমী এবং ত্রিকোণমিতি** (Trigonometry) **আল বাত্তানী আবিষ্কার কোরেছেন বোলেই যেমন ঐ বিজ্ঞান মোসলেম জাতির সম্পদ নয় তেমনি আপেক্ষিক তত্ত্ব (**Theory of Relativity) **এলবার্ট আইনষ্টাইন আবিষ্কার কোরেছেন বোলেই তা ইহুদী জাতির সম্পদ নয়- সবগুলোই সমগ্র মানবজাতির সম্পদ।**

মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সভ্যতা জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা কোরে তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছে। যখন যে জাতি বা সভ্যতার প্রাণশক্তি (Dynamism) বৃদ্ধি পেয়েছে সেই জাতি বা সভ্যতা জ্ঞান, বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ কোরেছে এবং সমগ্র মানবজাতি তা থেকে উপকৃত হোয়েছে। এখানে আল্লাহর রসুল একটি হাদীসের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বোলেছেন- জ্ঞান আহরণের জন্য চীনেও যাও (হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)। বিশ্বনবীর সময় জ্ঞান- বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে (Science and Technology) চীনদেশ ছিলো পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত, তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের (উম্মাহ) তদানিন্তন পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র চীনে যেয়ে ঐ জ্ঞান আহরণের আদেশ দিয়েছেন।

এ কথা আহাম্মকেও বুঝবে যে এই হাদীসে 'জ্ঞান' শব্দ দিয়ে তিনি দীনের জ্ঞান বোঝান নি, কারণ আল্লাহর রসুলকে মদীনায় রেখে দীনের জ্ঞান শেখার জন্য চীনে যাওয়ার, যে চীন তখনও এসলামের নামই শোনে নি, কোন অর্থই হয় না। বিশ্বনবী এখানে 'জ্ঞান' বোলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বুঝিয়েছেন। মহানবীর ঐ আদেশের সময় এই জাতিটি, যেটা বর্ত্তমানে মোসলেম বোলে পরিচয় দেয়, সেটা জীবিত (Dynamic) ছিলো, এবং জীবিত ছিলো বোলেই সেটা নেতার আদেশ শিরোধার্য্য কোরে জ্ঞান- বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পৃথিবীর শিক্ষকের আসন অধিকার কোরে নিয়েছিলো। তারপর আল্লাহ ও রসুল জ্ঞান বোলতে যা বুঝিয়েছেন তা থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে যখন এ জাতি 'জ্ঞান' কে শুধু ফতোয়ার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোরলো তখন এটা অশিক্ষা- কুশিক্ষায় পতিত হোয়ে মৃত হোয়ে গেলো এবং আজও সেই মৃতই আছে।

আল্লাহ 'জ্ঞান' বোলতে কি বুঝেন? মুসা (আঃ) একবার আল্লাহকে সাতটি প্রশ্ন কোরেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো- আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী কে? আল্লাহ বোললেন যে জ্ঞানার্জনে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং **মানুষের অর্জিত জ্ঞানকেও** যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের মধ্যে জমা কোরতে থাকে (হাদীসে কুদসী- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বায়হাকী ও ইবনে আসাকির; আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (রঃ) এর 'হাদীসে কুদসী' গ্রন্থের ৩৪৪ নং হাদীস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আল্লাহ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ কোরেছেন। প্রথমটি তাঁর দেয়া জ্ঞান যা তিনি সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর নবী- রসুলদের মাধ্যমে

তাঁর কেতাবসমূহে মানবজাতিকে অর্পণ কোরে আসছেন, যার শেষ কেতাব বা বই হোচ্ছে আল-কোরান। এটা হোচ্ছে অর্পিত জ্ঞান। আর মানুষ পড়াশোনা, চিন্তা- ভাবনা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোরে যে জ্ঞান অর্জন করে তা হোল অর্জিত জ্ঞান। মুসার (আঃ) প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট কোরে 'মানুষের অর্জিত জ্ঞান' বোললেন, শব্দ ব্যবহার কোরলেন 'আন্‌নাসু', মানুষ। অর্থাৎ যে আল্লাহর অর্পিত জ্ঞান, অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে জ্ঞান, এবং মানুষের অর্জিত জ্ঞান- এই উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন কোরতে থাকে এবং কখনোই তৃপ্ত হয় না অর্থাৎ মনে করে না যে তার জ্ঞানার্জন সম্পূর্ণ হোয়েছে, আর প্রয়োজন নেই, সেই হোচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী, আলেম। বর্ত্তমানে যারা নিজেদের আলেম, অর্থাৎ জ্ঞানী মনে করেন, আল্লাহর দেয়া জ্ঞানীর সংজ্ঞায় তারা আলেম নন, কারণ শুধু দীনের জ্ঞানের বাইরে মানুষের অর্জিত জ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের সামান্যতম জ্ঞানও নেই এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে পিপাসাও নেই।

আমি পেছনে একাধিকবার বোলে এসেছি যে আজ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটি, যেটি নিষ্ঠাভরে সালাহ, যাকাহ, হজ্ব, সওম (রোযা) ছাড়াও হাজারো নফল এবাদত ও তাকওয়া অবলম্বন করে সেটি তার আকীদার বিকৃতিতে এলাহ শব্দের অর্থ যে সার্বভৌমত্ব তা না বুঝে, সেটাকে মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য মনে কোরে, অজ্ঞানতার অন্ধত্বের কারণে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।

কোন সন্দেহ নেই যে অনেকেই আমার এ কথায় বিব্রত হবেন, অনেকে ঘোর আপত্তি কোরবেন তারা বোলবেন- কখনোই না! আমরা দাজ্জাল কে সাজদা কোরি না। আমরা শুধু আল্লাহকে সাজদা কোরি। সাজদা করার অর্থ কি? সাজদার প্রকৃত অর্থ হোল কাউকে, কোন শক্তিকে সর্বতোভাবে স্বীকার কোরে নেয়া, তার তৈরী করা আইন- কানুন, তার আকীদাকে মেনে নেয়া, তার দেয়া মূল্যবোধকে, ন্যায়- অন্যায়ের মানদণ্ডকে স্বীকার কোরে তা জীবনে কার্য্যকর করা, তার নিয়ম মোতাবেক চলা; শুধু মাথা মাটিতে ঠেকানোই সাজদা নয়। আকাশ, মাটি, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা, এক কথায় সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহকে সাজদা করে (কোরান- সুরা রা'দ, আয়াত ১৫; সুরা আর রহমান, আয়াত ৬) অর্থাৎ এরা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সমস্ত আইন- কানুন মেনে চলে। এরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আল্লাহকে সাজদা করে না।

দাজ্জাল নিজেকে রব অর্থাৎ প্রভু, পালনকর্ত্তা বোলে ঘোষণা কোরবে ও মানবজাতিকে তা স্বীকার কোরতে আদেশ কোরবে। মোসলেম বোলে পরিচিত এ জাতিটিসহ সমস্ত মানবজাতি দাজ্জাল কে স্বীকার কোরে নিয়েছে ও তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে অর্থাৎ দাজ্জালের সৃষ্ট বিভিন্ন 'তন্ত্র' বা 'বাদ'গুলিকে গ্রহণ কোরে তাদের জাতীয় জীবনে তা প্রয়োগ কোরে সেই মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা কোরছে- এক কথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ কোরে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরেছে, আল্লাহর দেয়া মূল্যবোধকে ত্যাগ কোরে দাজ্জালের দেয়া মূল্যবোধকে গ্রহণ কোরে তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে।

মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থা

১৪০০ বছর আগে আল্লাহর শেষ রসুল আমাদের এই সময় সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কোরে গেছেন আজ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হোচ্ছে। পৃথিবীতে একটা টুকরো মাটি বা পানি নেই যা দাজ্জালের (ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার, Judeo-Christian Technological Civilization) শক্তি ও প্রভাব বলয়ের বাইরে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের **১৩** নং ও **১৪** নং হাদীস)। মানবজাতির কাছে দাজ্জাল দাবি কোরছে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেন তাকে রব (প্রভু, প্রতিপালক) বোলে মেনে নেয়, অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরিত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়। মানুষের সার্বভৌমত্বের যে কয়টি ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদিকে পরাজিত কোরে **বর্ত্তমানে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রই জয়ী এবং এর সার্বভৌমত্বই মেনে নেয়ার দাবি দাজ্জালের।** দাজ্জালের এই দাবির কাছে মানবজাতি আজ আত্মসমর্পণ কোরেছে। যে এসলামের ভিত্তিই হোচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (তওহীদ), যে সার্বভৌমত্ব ছাড়া এসলামই নেই, সেই এসলামের দাবিদার, 'মোসলেম' বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটিও ভুল আকীদার কারণে প্রায় সম্পূর্ণটাই ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাবভৌমত্ব মেনে নিয়েছে, অর্থাৎ দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়েছে। দাজ্জালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা তো বটেই, দাজ্জালের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ইত্যাদিতে (এ বিষয়ে পাঠকের কৌতুহল হোলে তাকে আমার লেখা "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি পড়তে অনুরোধ কোরছি), যেখানে দাজ্জালের তৈরী করা এসলামের আলেম ওলামা, আল্লামা, মাশায়েখরাও দাজ্জালের দেয়া মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নিয়েও ভাবছেন তারা মো'মেন, মোসলেমই আছেন।

এই মোসলেম জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা কোরছে। **এই ক্ষুদ্র অংশটিরও এসলাম সম্বন্ধে সঠিক আকীদা নেই।** মানুষ সৃষ্টি কোরে এই পৃথিবীতে তাকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত কোরে (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩০), মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়ে (কোরান- সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২), তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩৬), মানুষের দেহ-আত্মার মধ্যে এবলিসকে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে (কোরান- সুরা বনী এসরাঈল ৬৪), তারপর আবার নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ অর্থাৎ দিক নির্দেশনা দিয়ে (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ৩৮) তার উদ্দেশ্য কি, এক কথায় এসলাম কী এ সম্বন্ধে তাদের সঠিক আকীদা (Comprehensive Concept) নেই। অথচ তারা আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে ও দীনুল এসলামকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, আর তাই তারা দাজ্জালের দাবি গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বকে মানতে রাজী নন, তারা চান পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। দুর্ভাগ্যক্রমে এরা জানেন না সত্যদীন (দীনুল হক) কী, এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়া কী। **এরা খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় খৃষ্টানদের তৈরী করা এক প্রাণহীন এসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভুল পথে, ভুল প্রক্রিয়ায় চেষ্টা কোরছেন।** দাজ্জালের পৃথিবীব্যাপী মহাশক্তির বিরুদ্ধে এরা অসহায়। দাজ্জালের প্রযুক্তি (Technology), অসংখ্য বোমারু বিমান, অসংখ ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই নেই। তাই তারা মরিয়া হোয়ে এখানে ওখানে বোমা মেরে, পর্যটন কেন্দ্রে হামলা কোরে

দাজ্জাল কে প্রতিহত কোরতে চাইছেন। আল্লাহ, রসুল ও এসলামের জন্য এরা এমন উৎসর্গীকৃত যে তারা শরীরে বোমা বেঁধে তা ফাটিয়ে শত্রু হত্যা কোরতে চেষ্টা কোরছেন। **তারা বুঝছেন না দাজ্জাল কে প্রতিরোধ, সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার এগুলো সঠিক পথ নয়,** সমস্ত পৃথিবী যার হাতে, 'মোসলেম' নামসর্বস্ব জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতি যার পায়ে সাজদায় প্রণত **সে মহাশক্তিধর দানবের এতে কিছুই হবে না। কিছু তো হবে না-ই বরং তার লাভ হবে এবং হোচ্ছে।** এদের 'সন্ত্রাসী' (Terrorist), 'মৌলবাদী' (Fundamentalist), 'চরমপন্থী' (Extremist), 'জঙ্গী' (Militant) ইত্যাদি বহুবিধ নামে আখ্যায়িত কোরে, 'মোসলেম' জনসংখ্যাসহ সমস্ত মানবজাতিকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কোরে দিয়েছে। এই মোসলেম জনসংখ্যার মহা-মুসুল্লীগণও যারা দাজ্জালের পায়ে সাজদায় পোড়ে আছেন তারা এই 'সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে, তাদের তারা ঘৃণা করেন।

দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এই অতি ক্ষুদ্র দলকে বুঝতে হবে দাজ্জাল কে প্রতিরোধের এই পথ ভুল। তাদের বুঝতে হবে এসলাম অর্থাৎ সত্যদীন (দীনুল হক) কী এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রক্রিয়া কী। তাদের বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি কোরতে হবে যে **পৃথিবীতে সত্যদীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র সঠিক নীতি, পথ ও প্রক্রিয়া হোচ্ছে শুধু সেইটা যেটা আল্লাহর রসুল নিজে কোরেছেন এবং আমাদের শিখিয়ে গেছেন।** ঐ পথ ছাড়া আর কোনও পথে, কোনও প্রক্রিয়ায় তারা আল্লাহর সাহায্য পাবেন না, তারা সফলও হবেন না এবং হোচ্ছেন না।

দাজ্জালের রব হবার দাবীর বিরুদ্ধে আজ যে ক্ষুদ্র জনসমষ্টি দাঁড়িয়েছে, যাদের দাজ্জাল নাম দিয়েছে 'সন্ত্রাসী', তারা পৃথিবীর কোথাও ঐ মহাশক্তিধর দানবের সাথে পেরে উঠছেন না। **কারণ তাদের জন্য আল্লাহর কোন সাহায্য নেই।** আল্লাহর সাহায্য নেই তার প্রধান কারণ দু'টো। প্রথমত- তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অর্থ বোঝেন না, তারা 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' এই কলেমার এলাহ শব্দের ভুল অর্থ করেন। তারা এলাহ শব্দের অর্থ করেন মা'বুদ অর্থাৎ যাকে উপাসনা করা হয়। এলাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ হোল- যার হুকুম, আদেশ, নির্দেশ শুনতে ও পালন কোরতে হবে, আনুগত্য কোরতে হবে অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব। আর মা'বুদ শব্দের প্রচলিত অর্থ হোল- যাকে উপাসনা করা হয়, সেখানে সামগ্রিক জীবনে যার আদেশ নির্দেশ পালন করার, আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই (মা'বুদ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানার জন্য 'প্রকৃত এবাদত' অধ্যায় দেখুন)। এই ভুল অর্থের পরিণাম আজ এই হোয়েছে যে সমস্ত মানবজাতি, এই তথাকথিত 'মোসলেম' জনসংখ্যাসহ, মহাসমারোহে বিরাট বিরাট কারুকার্য্যময় অতি সুদৃশ্য মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায়, সিনাগগে ও প্যাগোডায় আল্লাহর উপাসনা করে, এবাদত করে, কিন্তু তাদের সমষ্টিগত জীবনে, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, বিচার ফায়সালায়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে আল্লাহকে, তাঁর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বের আনুগত্য করে, আর দাজ্জাল মানবজাতির কাছে ঠিক এটাই চায়। যে কলেমার ভিত্তির উপর দীনুল হক অর্থাৎ সত্য জীবন-ব্যবস্থার এমারত দাঁড়িয়ে আছে সেই কলেমার ভুল অর্থের আরেক পরিণাম এই হোয়েছে যে প্রকৃত, সঠিক এসলাম আজ হারিয়ে গেছে এবং বর্ত্তমানের 'লা মা'বুদ এল্লা আল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' কলেমার **বিকৃত এসলামটাকেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঐ ক্ষুদ্র দলটি কোরে যাচ্ছেন, কোথাও সফল হোচ্ছেন না এবং হবেনও না** কারণ আল্লাহ বিকৃত এসলামকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সাহায্য কোরবেন না। দ্বিতীয়ত- এরা যে এসলামটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম কোরছেন এবং যে সংগ্রামে তাদের

জানমাল উৎসর্গ কোরছেন সেটা প্রকৃত এসলামই নয়। শুধু যে প্রকৃত এসলামই নয় তাই নয়, সেটার আকীদা এবং পথ রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত এসলামের একেবারে বিপরীত।

দাজ্জাল কে ভালোভাবে বুঝতে গেলে সার্বভৌমত্ব কি তা আগে বুঝতে হবে। মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই একটা জীবন- ব্যবস্থা ছাড়া সে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস কোরতে পারে না। এবং সেই জীবন- ব্যবস্থা হোল দীন। সুতরাং সেই জীবন- ব্যবস্থা বা দীনে আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি, সবই থাকতে হবে। অবশ্য অবশ্যই থাকতে হবে এবং এর একটা সার্বভৌমত্বও অবশ্যই থাকতে হবে; সার্বভৌমত্ব ছাড়া তা চোলতেই পারবে না। কারণ যখনই আইন, দণ্ডবিধি অর্থনীতি বা যে কোন ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখনই একটা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন হবে। উদাহরণ- সমাজে অপরাধ দমনের জন্য নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত কিনা। কিম্বা সমাজের সম্পদ সঠিক এবং সুষ্ঠু বিতরণের জন্য অর্থনীতি সুদ ভিত্তিক হওয়া সঠিক কিনা? সমাজের নেতারা যদি ঐ সব বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ, যুক্তি- তর্ক করেন তবে তা অনন্তকাল ধোরে চোলতে থাকবে- কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না, কারণ এইসব বিষয়ে প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। একদল বোলবেন- নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড আইন না কোরলে সমাজে নরহত্যা থামবে না, বাড়বে; আরেক দলের মত এই হবে যে মৃত্যুদণ্ড বর্বরোচিত, নৃশংসতা, এ কখনো আইন হোতে পারে না; আরেক দল হয়তো এই মত দেবেন যে একটি নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে একাধিক নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড আইন করা হোক। একাধিক অর্থে কয়টি নরহত্যা কোরলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, দুইটি না একশ'টি তাও প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়াবে। এবং এ বিতর্ক অনন্তকাল চোলতে থাকবে।

অনুরূপভাবে সমাজের অর্থনীতি সুদভিত্তিক হওয়া সঠিক না লাভ লোকসান ভিত্তিক হওয়া উচিত এ নিয়ে বিতর্কের কোনদিন অবসান হবে না যদি না সিদ্ধান্ত নেবার মত একটা ব্যবস্থা না থাকে। কাজেই যে কোন জীবন- ব্যবস্থায়ই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি স্থান থাকতেই হবে। অন্যথায় জীবন- ব্যবস্থার যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ আলোচনায় বসলে তা অনন্তকাল চোলতে থাকবে। এই শেষ সিদ্ধান্ত নেবার ও দেবার কর্তৃত্ব ও অধিকারই হোচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব হোতে পারে মাত্র দুই প্রকার। যিনি সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর, স্রষ্টার; কিম্বা সৃষ্টের অর্থাৎ মানুষের। স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের জন্য একটা জীবন- ব্যবস্থা দিয়েছেন যাকে তিনি বোলেছেন দীন, সুতরাং তিনি নিজেই সেটার সার্বভৌম। ঐ দীনের মধ্যেই তিনি মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, এক কথায় ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি যে কোন পর্যায়ে অবিচার, অশান্তি, অন্যায়, অপরাধহীন একটা সমাজ গঠন কোরে সেখানে বাস করার জন্য তার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ যদি স্রষ্টার ঐ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ আদেশগুলি মেনে নিয়ে সেই মোতাবেক তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন পরিচালিত করে তবে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিলো। আর যদি সে আল্লাহর দেয়া সিদ্ধান্তগুলিকে অস্বীকার করে, তবে তাকে অতি অবশ্যই অন্য একটি জীবন- ব্যবস্থা অর্থাৎ দীন তৈরী কোরে নিতে হবে, কারণ একটা জীবন- ব্যবস্থা ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে বাস কোরতে পারে না, তা অসম্ভব। এই নতুন জীবন- ব্যবস্থা তৈরী কোরতে গেলেই সেখানে অতি অবশ্যই একটি শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, অধিকার থাকতে হবে; এবং যেহেতু স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করা হোল, সেহেতু এই শেষ সিদ্ধান্তের স্থান, কর্তৃত্ব অধিকার (Aut hor i t y) হোতে হবে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের।

সমগ্র মানবজাতি, 'মোসলেম' বোলে পরিচিত ১৫০ কোটির এই জনসংখ্যাসহ, আজ স্রষ্টার, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ) ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরেছে। **এই দুই সার্বভৌমত্ব বিপরীতমুখী, একটি স্রষ্টার, অন্যটি সৃষ্টের; এ দু'টি সাংঘর্ষিক।** আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপরই এসলাম প্রতিষ্ঠিত, এই সার্বভৌমত্ব ছাড়া কোন এসলাম নেই। আল্লাহর এই সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে দাজ্জাল আজ দাঁড়িয়েছে সৃষ্টির অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ, প্রতিনিধি হোয়ে। হওয়ার কথা ছিলো এই যে 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসের দাবীদার 'মোসলেম' বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা নিজেদের সর্বপ্রকার বিভেদ ভুলে যেয়ে মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি দাজ্জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। দুর্ভাগ্যক্রমে তা তো হয়ই নাই বরং এই 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' যিকরকারী, মোসলেম হবার দাবীদার জনসংখ্যার প্রায় সবটাই হয় গণতন্ত্র, না হয় রাজতন্ত্র, না হয় সমাজতন্ত্র, না হয় একনায়কতন্ত্রের কোন না কোনটা মেনে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়ে আছে।

দাজ্জাল , অর্থাৎ ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা **প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, একাধিকবার দিয়েছে যে সে সমস্ত পৃথিবীতে গণতন্ত্র অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরবে।** এ কাজ সে অনেক আগে আরম্ভ কোরেছে এবং তা বহুমুখী; পৃথিবীব্যাপী প্রচার মাধ্যমে (Medi a) , শিক্ষা- ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং শক্তি প্রয়োগ কোরে। দাজ্জাল ভালো কোরে জানে যে তার সম্মুখে প্রধান বাধা এসলাম বোলে দীনটি যার বুনিয়াদ, ভিত্তিই হোল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ) অর্থাৎ যার সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কারোও সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা। তার সম্মুখে আর কোন বাধা নেই, কারণ পৃথিবীর বাকি জাতিগুলি মানুষের সার্বভৌমত্বকে ইতোমধ্যেই মেনে নিয়েছে। প্রচার (Medi a) ও শিক্ষা- ব্যবস্থার ফলে মোসলেম বোলে পরিচিত এ জনসংখ্যার নেতৃত্ব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাগ দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়ে গেছে। বাকি শুধু একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা যারা দাজ্জাল কে 'দাজ্জাল ' বোলে না বুঝেও শুধু সে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যাকে তার হুকুমের দাসে পরিণত করার চেষ্টা কোরছে, এইটুকুর জন্য এই মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

দাজ্জালের ইহুদী- খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতার কাছে আছে বিরাট বিশাল সামরিক শক্তি, এবং আছে প্রভূত পার্থিব সম্পদ। দাজ্জাল বিরোধী এই ক্ষুদ্র সংখ্যার কাছে ওসব কিছুই নেই, তাদের পার্থিব সম্পদ, তেল গ্যাস ইত্যাদিও তাদের হাতে নেই, সেগুলো তাদের সরকারগুলোর হাতে, যারা ইতোমধ্যেই দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে কার্য্যতঃ অস্বীকার কোরে দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বকে তাদের এলাহ বোলে স্বীকার কোরে নিয়েছে। সুতরাং মরিয়া হোয়ে তারা ভুল কাজ কোরছেন। তারা এখানে ওখানে বোমা ফাটাচ্ছেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস কোরছেন। তাতে দাজ্জালের কোন ক্ষতি না হওয়ায় তারা শরীরে বোমা বেঁধে আত্মঘাতি হোচ্ছেন। এতে দাজ্জালের কী ক্ষতি হোয়েছে? ধরতে গেলে কিছুই না। টুইন টাওয়ার গেছে তাতে দাজ্জালের কী হোয়েছে? এখন ঐ স্থানেই সেই টুইন টাওয়ারের চেয়েও বড় টাওয়ার তৈরী কোরছে। **বরং দাজ্জালের এতে লাভ হোচ্ছে।** পৃথিবীর মানুষকে সে বোলছে যে- দ্যাখো! এরা কি রকম সন্ত্রাসী। এরা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ, স্ত্রীলোক, শিশু হত্যা কোরছে আত্মঘাতি বোমা মেরে। এদের ধর, মার, জেলে দাও, ফাঁসি দাও। পৃথিবী দাজ্জালের এ কথা মেনে নিয়েছে এবং দাজ্জালের নির্দেশ মোতাবেক তাই কোরছে, কারণ ইংরাজি প্রবাদ বাক্য M ght i s r i ght অর্থাৎ মহাশক্তিধরের কথাই ঠিক।

এ প্রবাদ বাক্য যে সত্য তা এ থেকেই প্রমাণ হয় যে পৃথিবীর মানুষ টুইন টাওয়ারের দুই আড়াই হাজার মানুষ হত্যার জন্য দাজ্জালের আখ্যায়িত 'সন্ত্রাসীদের' ঘৃণা করে, কিন্তু হিরোশিমা নাগাসাকির কয়েক লক্ষ নর- নারী, শিশু, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা হত্যার জন্য দাজ্জাল কে ঘৃণাতো করেই না বরং তার পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়ে আছে, তার একটু কৃপা পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে। টুইন- টাওয়ারে শুধু কার্য্যক্ষম নরনারী ছিলো, কিন্তু নাগাসাকি হিরোশিমাতে নর- নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, হাসপাতাল ভর্ত্তি রোগী, স্কুল, কলেজ, সবই ছিলো এবং ঐ সবই দাজ্জাল এটম বোমা মেরে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কোরে দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধোরে দাজ্জাল (তদানিন্তন সোভিয়েট ইউনিয়নসহ কারণ সোভিয়েট ইউনিয়নও মানুষের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী) আফগানিস্তানে এবং ইরাকে প্রায় প্রতিদিন বেসামরিক মানুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা, পঙ্গু, রোগী হত্যা কোরে চোলেছে। এগুলোর মোট সংখ্যা 'সন্ত্রাসীদের' বোমা এবং আত্মঘাতি হামলায় বেসামরিক নর নারী শিশুর হত্যার সংখ্যার হাজার গুণ বেশী। এ কাজের জন্য কেউ দাজ্জাল কে সন্ত্রাসী বলে না, তাকে ঘৃণাও করে না, তার তাবেদারি কোরতে পারলে গদ গদ চিত্ত হোয়ে যায়। কেন? ঐ প্রবাদ বাক্য- Might is right, শক্তিই হোল ন্যায়- অন্যায়ের মানদণ্ড।

মহাসত্য হোচ্ছে এই যে- আল্লাহর রসুলের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন হোচ্ছে এই যে, দাজ্জাল হোচ্ছে বর্ত্তমানের ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা, তার বাহন হোচ্ছে যান্ত্রিক প্রযুক্তি (Scientific Technology), যে বাহনের হাতে, শরীরে অজস্র যুদ্ধাস্ত্র, বোমারু বিমান, যুদ্ধ- জাহাজ, ট্যাঙ্ক, কামান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং আণবিক বোমা ইত্যাদি। এই অস্ত্রের শক্তিতে মহাশক্তিধর হোয়ে সে মানবজাতিকে বোলছে, তোমরা আমাকে প্রভু (রব) বোলে স্বীকার করো, আমার আদেশ পালন করো, এবং তোমরা স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করো। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অনেক পুরানো ব্যাপার, ওটা অকেজো হোয়ে গেছে। তবুও তোমরা যার যার ধর্ম পালন করো কোন সমস্যা নেই। মুসলমান, তোমরা যত খুশি লম্বা দাড়ি রেখে, মোছ কেটে ফেলে, পাজামা হাঁটু পর্যন্ত টেনে উঠিয়ে মসজিদে দৌঁড়াও, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামায পড়ো, আমার কোন আপত্তি নেই; খৃষ্টান, তুমি লম্বা জোব্বা পোরে, গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে, গীর্জায় যেয়ে যত খুশি নীতিবাক্য, বক্তৃতা কোরতে চাও করো, আমার কোন আপত্তি নেই; বৌদ্ধ, তুমি গেরুয়া বসন গায়ে দিয়ে, মাথা ন্যাড়া কোরে, ভিক্ষা কোরে খাবার সংগ্রহ কোরে প্যাগোডায় যেয়ে বুদ্ধের মুর্ত্তির সামনে বোসে যত খুশি 'বুদ্ধং স্বরণং গচ্ছামী, সংঘং স্বরণং গচ্ছামী' গাও কোন আপত্তি নেই; হিন্দু, তুমি নামাবলি গায়ে দিয়ে কপালে সিঁদুর আর চন্দনের ফোটা দিয়ে তোমাদের হাজারো রকম মন্দিরের যেটায় খুশি যেয়ে হাজারো রকম মুর্ত্তির সামনে বোসে ঘণ্টা বাজাও, কোন আপত্তি নেই; ইহুদী, তোমরা লম্বা আলখালা গায়ে দিয়ে মাথায় উঁচু টুপি পোরে, বুকে ডেভিডের স্টার ঝুলিয়ে সিনাগগে যেয়ে প্রার্থনা করো, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তো নেইই, বরং এগুলো তোমরা যত বেশি কোরবে আমি তত খুশি হবো; কারণ তোমরা ওগুলো নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকবে আমি তত নিরাপদ হবো।

কিন্তু সাবধান! কখনো সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলো না, ও ব্যাপারে ফায়সালা হোয়ে গেছে। আমি মানবজাতিকে বাধ্য কোরেছি আমাকে প্রভু (রব) বোলে মেনে নিতে; অর্থাৎ আমার উপদেশ মেনে নিতে। আমার উপদেশই আমার আদেশ। এবং তাদের সামষ্টিক জীবনে অর্থাৎ রাষ্ট্র, আর্থ- সামাজিক জীবনে মানুষকে সার্বভৌম (এলাহ্) বোলে মেনে নিতে বাধ্য কোরেছি।

যদি কোনও ব্যক্তি বা দল আমার উপদেশ অর্থাৎ আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে সেই ব্যক্তি বা দল যেই রাষ্ট্রের বাসিন্দা সেই রাষ্ট্রের সরকারকে আমার অসন্তুষ্টি জানিয়ে দিলেই আমার মেজাজ খুশি রাখার জন্য সেই রাষ্ট্রের সরকার তার সর্বশক্তি নিয়ে সেই ব্যক্তি বা দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে সেটাকে ধ্বংস কোরে দেয়; আমার কিছুই কোরতে হয় না। আর যদি কোন রাষ্ট্র আমার আদেশ মানতে গড়িমসি করে বা অমান্যই করে তবে প্রথমত আমি সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) আরোপ কোরি। যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আমার প্রভুত্বকে (রবুবিয়াহ্) ও মানুষের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নিয়েছে, সেহেতু তারা আমার উপদেশ (আদেশ) অনুযায়ী সে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা- বাণিজ্য, যোগাযোগ বন্ধ কোরে দিয়ে সেটাকে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাতে যদি কাজ না হয় তবে আমি সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবরোধ (Embargo) স্থাপন কোরি। বাকি পৃথিবীর সঙ্গে সেটার সমস্ত রকম সম্পর্ক কেটে দিয়ে সেটাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ কোরে দেই।

এতেও যদি সে রাষ্ট্র আমার প্রভুত্ব ও মানুষের সার্বভৌমত্বের কাছে আত্মসমর্পণ না করে তবে আমি সেটাকে সামরিকভাবে আক্রমণ কোরে সে রাষ্ট্র দখল কোরে নিয়ে সেখানে আমার আনুগত্য ও মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকারকারী সরকার স্থাপন কোরি। এই প্রক্রিয়ায় ঐ রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, কামানের হামলায় নিহত হয়। কোটি কোটি শিশু, বৃদ্ধ- বৃদ্ধা পঙ্গু, বিকলাঙ্গ হয়। সে দেশের সমস্ত স্থাপনা ধ্বংস হয়। এ সত্ত্বেও আমাকে তা কোরতে হবে কারণ সমস্ত পৃথিবীতে আমার প্রভুত্ব (রবুবিয়াহ্) ও স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে (উলুহিয়াহ্) হটিয়ে মানুষের সমষ্টিগত জীবনে মানুষেরই সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা আমার অঙ্গীকার, আমার ক্রুসেড (Crusade) । এ ক্রুসেডে আমি ইতোমধ্যেই সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে বিশ্বজয়ী হোয়েছি। মানুষের সার্বভৌমত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠা হোয়েছে। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ্) আর কোথাও নেই। কিন্তু আমার প্রভুত্বকে (রবুবিয়াহ্) এখনো কিছু কিছু রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে অস্বীকার কোরছে। তাদের মধ্যে দু'টি রাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ কোরে ও পরে অবরোধ কোরেও বাগ মানাতে না পেরে তাদের সামরিকভাবে আক্রমণ কোরে পরাজিত কোরে আমার অবাধ্য সরকার ভাগিয়ে দিয়ে সেখানে আমার একান্ত অনুগত সরকার ক্ষমতায় বোসিয়েছি। আরও যদি কোন রাষ্ট্র আমার প্রভুত্ব মানতে রাজি না হয় তবে তাদেরও দশা ঐ দুই রাষ্ট্রের মতই হবে।

দাজ্জালের এই দাবী, এই হুকুমের বিরুদ্ধে বলার বিশেষ কিছুই নেই। বাস্তবতাকে (Reality) স্বীকার কোরে নিয়ে হিসাব কোরলে দেখা যায় যে স্রষ্টা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (উলুহিয়াহ, লা এলাহা এল্লা আল্লাহ) ও মানুষের সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্বে ইতোমধ্যেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পরাজিত হোয়ে গেছে। কারণ অতি সরল- যার সঙ্গে দাজ্জালের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের রক্ষাকারী মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটি, 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' **কলেমার ভুল অর্থ কোরে এলাহ শব্দের অর্থকে একমাত্র হুকুমদাতার বদলে একমাত্র উপাস্য বোলে রূপান্তর কোরে** সমষ্টিগত, জাতীয় জীবনে আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে প্রত্যাখ্যান কোরে, ইহুদী- খৃষ্টানদের আদেশ প্রতিপালন কোরে, পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ চাকচিক্যময় মসজিদ তৈরী কোরে তাতে মহা-ধুমধাম কোরে এবাদত কোরে দাজ্জালের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তার পক্ষ হোয়ে গেছে। এই জনসংখ্যাটি যে এমন কোরবে তা আল্লাহর রসুল বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন (পরিচিতি অধ্যায় ১২ নং হাদীস এবং ঐ অধ্যায়ের শেষে ক এবং খ হাদীস), এমন কি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র ও তাঁর নবীর মদিনার অভিভাবক রাজশক্তিটি পর্যন্ত দাজ্জালের পায়ে সাজদায় অবনত হোয়ে গেছে, তার আদেশ প্রাণপণে পালন কোরে চোলেছে। না কোরলে

দাজ্জালের আদেশে তার সিংহাসন হারাবার ভয় আছে। অনুরূপ অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলি রাজতন্ত্র ও আমীরতন্ত্রের। এ তন্ত্রগুলিও মানুষের সার্বভৌমত্বের অঙ্গীভুত। এরা সব এখন দাজ্জালের শক্তি বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ। এর বাইরে যে মোসলেম নামের জনসংখ্যা রোয়েছে সেগুলির শাসকশ্রেণী মানুষের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ দাজ্জালের অনুসারী।

তাহোলে কি সব আশাই শেষ? না; তা নয়। তা যে নয় তার কয়েকটি কারণ আছে। **প্রথম কারণ হোল** এই যে, আল্লাহ তাঁর কোরানে তাঁর শেষ রসুলকে রহমাতুল্লিল আ'লামিন বোলেছেন (কোরান- সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)। অর্থাৎ শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) সমস মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত রহমত। যারা তাঁকে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত দীন, জীবন- ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সেটাকে তাদের জীবনে কার্য্যকর কোরবে শুধু তাদের জন্যই তিনি আল্লাহর রহমত। আল্লাহ বোলেছেন তিনি তাঁর রসুলকে সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ কোরেছেন- কাজেই এক সময় সমস্ত মানবজাতি তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে পাওয়া দীনুল হক (সঠিক জীবন- ব্যবস্থা) তাদের জীবনে কার্য্যকর, প্রতিষ্ঠা কোরবে। তা না হোলে আল্লাহর দেয়া রহমাতুল্লিল আ'লামিন উপাধি অর্থহীন হোয়ে যায়। তা অসম্ভব।

দ্বিতীয় কারণ- আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন- আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়াত থাকবে (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং)। তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর হবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত; যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে মুলকান (রাজতন্ত্র); যতদিন আল্লাহ চান ততদিন থাকবে, তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে জাবারিয়াত (শক্তি প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন)। **তারপর আসবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত** (দালায়েলুম নবুয়াত- বায়হাকী, মুসনাদ- আহমদ বিন হাম্বল, মেশকাত)। রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশ নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হোয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশতো বিতর্কের বাইরে। তারপর তৃতীয় অংশ ইতিহাস। উমাইয়া যুগে খেলাফতের পদ্ধতি বদলিয়ে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হোল, যদিও রাজনৈতিক কারণে ও মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নাম খেলাফতই রোইলো। সমস্ত পৃথিবীতেই তখন রাজতন্ত্র চালু ছিলো; এসলামের খেলাফত তখন তাদের সামিল হোয়ে গেলো। পৃথিবীময় ঐ রাজতন্ত্র চললো কয়েক শতাব্দী। তারপর ৪৭৪ বছর আগে দাজ্জালের জন্ম হবার পর ধীরে ধীরে পৃথিবীর রাজতন্ত্রগুলি লোপ পেয়ে সেখানে দাজ্জালের অনুসারী বিভিন্ন তন্ত্র, বাদ, ইযম্ (-ism), ক্রেসি (-cracy) ইত্যাদি আসীন হোল। আরম্ভ হোল রসুল বর্ণিত জাবারিয়াত, শক্তির শাসন, Mght is right-এর শাসন, দাজ্জালের শাসন এবং এখন এটাই চোলছে। সুসংবাদ এই যে এর অবসান ঘোটবে এবং এর পর **এনশা'আল্লাহ আসছে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত।** এবং সেটা আসছে ঈসার (আঃ) হাতে দাজ্জালের ধ্বংসের পর।

তৃতীয় কারণ- আল্লাহর রসুল একদিন বোললেন- সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও। আমার উম্মাহর উদাহরণ এমন এক বৃষ্টির মত, যার প্রথম ভালো না শেষ ভালো বলা যায় না। ... এই উম্মাহ ধ্বংস হবে কেমন কোরে যার প্রথমে আমি, মধ্যে মাহ্দী এবং শেষে ঈসা; **কিন্তু এর মধ্যখানে আছে বিভ্রান্তরা; তারা আমার কেউ নয়, আমিও তাদের কেউ নই (**হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে তিরমিযি; জাফর (রাঃ) থেকে রাযিন)।

আল্লাহর রসুলের এই কথা থেকে বোঝা যায় যে আখেরী যমানায়, শেষ যুগে, বাইবেলের ভাষায় Last hour-এ এই উম্মাহর মানুষ আবার এমন মানুষে পরিণত হবে যারা রসুলের যুগের মানুষের মতই হবে। এবং এই উম্মাহর দুই প্রান্তের মানুষের এমনই মিল হবে যে উম্মাহর

স্রষ্টা স্বয়ং রসুলের পক্ষেই বলা মুশকিল হবে কোনটা ভালো। শোকর আলহামদোলেল্লাহ। আল্লাহর রসুলের এই হাদীস থেকে পরিষ্কার হোয়ে যাচ্ছে আরেকটি সত্য, যে সত্যটি আমরা অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ বারবার বোলে আসছি এবং সত্যটি বলার জন্য, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টার জন্য আমরা প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হোচ্ছি, বিশেষ কোরে বর্ত্তমান বিকৃত এসলামের আলেম শ্রেণীর কাছ থেকে অপমানিত হোচ্ছি, নিগৃহিত হোচ্ছি; সে সত্য হোচ্ছে এই যে আল্লাহর রসুলের ৬০/৭০ বছর পর থেকে ভবিষ্যতে মাহ্দী (আঃ) পর্যন্ত যে সময় অর্থাৎ বর্ত্তমানের মোসলেম নামধারী এই জনসংখ্যা রসুলের কেউ নয়, এবং রসুলও তাদের কেউ নন। আল্লাহর রসুল যাদের কেউ নন, এবং যারা রসুলের কেউ নয় তারা কি মোসলেম বা মো'মেন বা উম্মতে মোহাম্মদী? অবশ্যই নয়। এই জন্য নয় যে রসুল ও মাহ্দীর অন্তর্বর্ত্তিকালীন মোসলেম নামধারী বর্ত্তমানের এই জনসংখ্যাটি আল্লাহর অস্তিত্বকে, তাঁর একত্বকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাঁর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার কোরে দাজ্জালের অর্থাৎ জুডিও- খৃষ্টান সভ্যতার, যে সভ্যতার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর নয়, মানুষের, তা মেনে নিয়ে তার আনুগত্য কোরছে।

ঠিক এই অবস্থা ছিলো আরবের মানুষের চৌদ্দশ' বছর আগে যখন আল্লাহ তাঁর রসুলকে সেখানে পাঠালেন। তখনকার ঐ আরবরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে তেমনি বিশ্বাস কোরতো যেমন আজ আমরা কোরি; তিনি যে স্রষ্টা, প্রতিপালক, সব কিছুর নিয়ামক, তিনি যে সর্বশক্তিমান এ সব কিছুই তারা বিশ্বাস কোরতো (কোরান- সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯; সুরা আন্কাবুত, আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)। তারা এবরাহীমকে (আঃ) আল্লাহর নবী বোলে বিশ্বাস কোরতো; নিজেদের মিল্লাতে এবরাহীম বোলে বিশ্বাস কোরতো; এবরাহীম (আঃ) দ্বারা পুনর্নির্মিত কাবাকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরতো; কাবার দিকে মুখ কোরে এবরাহীমের (আঃ) শেখানো পদ্ধতিতে সালাহ (নামায) কায়েম কোরতো; কাবাকে কেন্দ্র কোরে বছরে একবার হজ্ব কোরতো; কাবা তওয়াফ (পরিক্রমা) কোরতো; সেখানে যেয়ে আল্লাহর রাস্তায় পশু কোরবানী কোরতো; বছরে একমাস, রমাদান মাসে সওম (রোযা) পালন কোরতো; এমন কি প্রত্যেকে এবরাহীমের (আঃ) শেখানো খাত্না কোরতো। তারা প্রতি কাজে আল্লাহর নাম নিতো, দলিল ইত্যাদি লিখতে, বিয়ে- শাদীর কাবিন লিখতে তারা প্রথমেই ওপরে আল্লাহর নাম লিখে আরম্ভ কোরতো। আমরা যেমন এখন লেখি বেসমেল্লাহের রহমান আর রহিম, তারা লেখতো বেসমেকা আল্লাহুম্মা; একই অর্থ। তাহোলে যাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আসলেন তাদের সাথে বর্ত্তমানের মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার তফাৎ কোথায়? যদি বলেন যে তারা মুর্ত্তিপূজা কোরতো তবে তার জবাব হোচ্ছে এই যে ঐ মোশরেক আরবরা ঐ মুর্ত্তিগুলোকে আল্লাহ বোলে বিশ্বাস কোরতো না, তাদের স্রষ্টা বোলেও বিশ্বাস কোরতো না, তাদের প্রভু (রব) বোলেও বিশ্বাস কোরতো না। একটু আগেই কোরানের যে আয়াতগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছি যেগুলোয় আল্লাহ তাঁর রসুলকে বোলছেন তাদের প্রশ্ন কোরতে, মোশরেকদের জবাব থেকেই, যে জবাবগুলি আল্লাহ স্বয়ং দিচ্ছেন মোশরেকদের পক্ষ থেকে তা থেকেই পরিষ্কার হোয়ে যায়। তাহোলে আরবদের কাছে ঐ মুর্ত্তিগুলি কী ছিলো? তাদের কাছে ঐ মুর্ত্তিগুলি আল্লাহ ছিলো না, তারা বিশ্বাস কোরতো ওগুলি আল্লাহর নিকটবর্ত্তী, ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয়জন। তারা ওগুলির পূজা কোরতো দু'টো কারণে- এক) যেহেতু ওগুলো আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সেহেতু তারা পূজারীদের পক্ষ হোয়ে কোন ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ কোরলে আল্লাহ তা মঞ্জুর কোরবেন। যেমন রোগ- শোক থেকে মুক্তি, ব্যবসা- বাণিজ্যে সাফল্য, কোন বিপদ থেকে উদ্ধার ইত্যাদি। এ কথার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ বোলছেন- তারা আল্লাহ ব্যতীত যার এবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও কোরতে পারে

না, উপকারও কোরতে পারে না। তারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী' (কোরান- সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)। দুই) তারা বিশ্বাস কোরতো যে যেহেতু ঐ মুর্ত্তিগুলি, ঐ দেব- দেবীগুলি আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় কাজেই তাদের পূজা কোরে তাদের সন্তুষ্ট কোরতে পারলে তারা পূজারীদের আল্লাহর সান্নিধ্য (কুরবিয়াহ) এনে দেবে। এ ব্যাপারেও আল্লাহ বোলেছেন- যারা আল্লাহর পরিবর্ত্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই কোরি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে'(কোরান- সুরা যুমার, আয়াত ৩)। দেখা যাচ্ছে- আরব মোশরেকদের মুর্ত্তিপূজার পেছনে দু'টো উদ্দেশ্য ছিলো, একটি দুনিয়াদারী, অন্যটি আখেরাত। ঐ মুর্ত্তিগুলিকে আরবের মোশরেকরা কখনই আল্লাহর স্থানে বসায় নাই।

তাহোলে প্রশ্ন হোচ্ছে- আজ মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি (কোন উম্মাহ নয়) যে দীনটাকে পালন কোরে নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস করে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে অর্থাৎ বেহেশতে যাবার আশা করে ঐ জনসংখ্যাটি এবং আরবের ঐ মোশরেকদের জাতিটি যার মধ্যে তাদের হেদায়াহর জন্য আল্লাহ তাঁর রসুল প্রেরণ কোরলেন এ দু'টোর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? কথাটা আরও পরিষ্কার কোরছি। বর্ত্তমানের এই দীন পাঁচটি রোকনের (স্তম্ভ) ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ কথায় কোন সন্দেহ আছে কি? অবশ্যই নয়; এবং সেগুলি হোলো- ১) কলেমা, ২) সালাহ (নামায), ৩) যাকাহ, ৪) হজ্ব, ৫) সওম (রোযা)। যারা এগুলির ওপর বিশ্বাস স্থাপন কোরে ওগুলি পালন করেন তাদের বলা হয় মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী। এখন দেখা যাক তদানিন্তন আরবদের সাথে অমিল কোথায়।

১) কলেমা। বর্ত্তমানের এই মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যা বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, তিনি উপাস্য, তিনি স্রষ্টা, তিনি রক্ষাকর্ত্তা, তিনি রব অর্থাৎ ভরণ- পোষণকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। ঐ সময়ের আরবরাও ঠিক এই কথাই বিশ্বাস কোরতো। কোরানে আল্লাহ নিজে এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন (কোরান- সুরা যুখরুফ, আয়াত ৯; সুরা আন্‌কাবুত, আয়াত ৬১ ও ৬৩; সুরা লোকমান, আয়াত ২৫)।

২) সালাহ (নামায)। মোসলেম বোলে পরিচিত বর্ত্তমানের এই জনসংখ্যার মত ঐ মোশরেক আরবরাও আল্লাহর ঘর কাবার দিকে মুখ কোরে সালাহ কায়েম কোরতো এ কথা ইতিহাস। আল্লাহর রসুলের ক্রীতদাস, পরে মুক্ত ও তাঁর সন্তান হিসাবে গৃহীত যায়েদকে (রাঃ) খুঁজতে খুঁজতে তার বাপ- চাচারা যখন শুনতে পেলেন যে যায়েদ (রাঃ) মক্কায় মোহাম্মদ (দঃ) নামের একজন লোকের কাছে আছে যিনি আল্লাহর নবী হবার দাবী কোরছেন। এ খবর শুনে তারা উত্তর আরব থেকে মক্কায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞাসা কোরলেন- আমরা মোহাম্মদ (দঃ) নামের একজন লোককে খুঁজছি, তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে। লোকজন বললো- নামাযের সময় কাবায় যাবেন, দেখবেন একজন লোক অন্য সব নামাযী থেকে বিচ্ছিন্ন, আলাদা হোয়ে একা নামায পড়ছেন, তিনিই আপনারা যাকে খুঁজছেন তিনি, মোহাম্মদ (দঃ); অর্থাৎ মক্কার মোশরেকরা কাবার দিকে মুখ কোরে জামাতে সালাহ (নামায) কায়েম কোরতো। অবশ্য ঐ সালাহ আল্লাহর নবী এবরাহীমের (আঃ) শেখানো পদ্ধতির ছিলো, শেষ রসুলাল্লাহর পদ্ধতিতে ছিলো না। বর্ত্তমানের সালাতের এই নিয়ম পদ্ধতি পরে এসেছে।

৩) যাকাহ। যে উদ্দেশ্যে যাকাহ দেওয়া অর্থাৎ নিজের উপার্জিত অর্থ থেকে সমাজের অন্য দুঃস্থ, গরিব বা অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ কোরতে সাহায্য দেয়া সে অর্থে ঐ মোশরেকরাও তাদের

উপার্জিত সম্পদ থেকে বহু দান- খয়রাত কোরতো, এটাও ইতিহাস। তাদের মধ্যে হাতেম তাঈ'র মত আরো অনেক দানশীল ছিলো। আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে সেই অনিয়মিত, ইচ্ছাকৃত দানকে একটা শৃংখলার (Di sci pl i ne) মধ্যে এনে এটাকে শতকরা আড়াই (২ ১/২) ভাগে নিবন্ধন কোরেছেন।

৪) হজ্ব। এ কথা ইতিহাস যে তদানিন্তন মোশরেক আরবরা বছরে একবার কাবাকে কেন্দ্র কোরে হজ্ব পালন কোরতো। তাদের ঐ হজ্বের সময়, মাস, তারিখ, নিয়ম কানুন প্রায় বর্ত্তমানের হজ্বের মতই ছিলো।

৫) সওম (রোযা)। তখনকার মোশরেকরাও বর্ত্তমানের দীনের মতই রমাদান মাসেই একমাস সওম (রোযা) পালন কোরতো। ঐ মোশরেক আরবদের সাথে তাহোলে বর্ত্তমানের মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার তফাৎ কী এবং কোথায়? ঐ আরবদের মধ্যে যদি রসুল পাঠানোর প্রয়োজন হোয়ে থাকে তবে এখনকার এই জনসংখ্যার অবস্থা কী?

উত্তর হোচ্ছে- অতসব এবাদত সত্ত্বেও, আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে বিশ্বাস (ঈমান) থাকা সত্ত্বেও, কাবাকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও, কাবার দিকে মুখ কোরে সালাহ (নামায) কায়েম করা সত্ত্বেও, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীন দরিদ্রের জন্য দান- খয়রাত (যাকাতের মত) করা সত্ত্বেও, প্রতি বছর কাবা কেন্দ্রিক হজ্ব করা সত্ত্বেও, রমাদান মাসে সওম (রোযা) করা সত্ত্বেও, এমন কি প্রত্যেকে খাত্না করা সত্ত্বেও ঐ **আরবরা মোশরেক ছিলো, কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' ছিলো না।** তাদের সার্বভৌম, এলাহ ছিলো কাবা ঘরের অভিভাবক, কোরায়েশরা। তাদের দীন ছিলো কোরায়েশরা যে সিদ্ধান্ত দেবে তা পালন করা। আজ যেমন এই জাতির এলাহ হোল দাজ্জাল । এবং দীন হোল মানবরচিত জীবন- ব্যবস্থা, তন্ত্র, মন্ত্র, বাদ, ক্র্যাসি ইত্যাদি।

বর্ত্তমানের মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা ঐ মোশরেক আরবদের মতই আল্লাহর অস্তিত্বে, একত্বে বিশ্বাসী, সালাহ (নামায) কায়েম করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান- খয়রাত (যাকাহ) করে, বছরে একবার হজ্ব করে, কাবা তওয়াফ করে, রমাদান মাসে সওম (রোযা) রাখে এবং খাত্না করে কিন্তু ঐ আরবদের মতই এ জনসংখ্যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ কোরে দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরে মানুষের সিদ্ধান্ত পালন কোরছে তাদের জাতীয় জীবনে। **এই পথভ্রষ্টতার সাংঘাতিক ভুলের একমাত্র কারণ হোচ্ছে কলেমার, 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ'র এলাহ শব্দের অর্থকে বদলিয়ে মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য করা।** অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র 'আদেশদাতা, সার্বভৌম' থেকে বদলিয়ে একমাত্র 'উপাস্যে' পরিণত করা যা আরবের মোশরেকরা কোরেছিলো এবং তা কোরে তাদের সমস্ত এবাদত সত্ত্বেও মোশরেক হোয়ে গিয়েছিলো। এবং এ জন্যই আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সার্বভৌমত্বকে আবার প্রতিষ্ঠা কোরতে এবং তাই তাঁর রসুল এসে সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মক্কার সমস্ত মানুষকে ডেকে এনে প্রথমেই বোলেছিলেন- বল (বিশ্বাস কর) 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ'। 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ'র অর্থ যদি আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ অর্থাৎ উপাস্য হয় তবে রসুলাল্লাহর ঐ ডাক অর্থহীন কারণ ঐ মোশরেকরা নামায পোড়ে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ কোরে, হজ্ব কোরে ও রমাদানের রোযা রেখে আল্লাহর উপাসক হোয়েই ছিলো, তাদের আবার আল্লাহকে উপাস্য মা'বুদ বোলে বিশ্বাস করার জন্য ডাক দেবার প্রয়োজন কি? আরবের এ মোশরেকরা কি নামায, দান- খয়রাত, হজ্ব, রোযা এগুলি ঐ দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কোরতো? অবশ্যই নয়- তারা আল্লাহর এবাদত হিসাবে কোরতো। মোশরেকরা কি উদ্দেশ্যে দেব- দেবীর পূজা কোরতো তা আল্লাহ

নিজে তাঁর কোরানে পরিষ্কার বোলে দিয়েছেন (কোরান- সুরা যুমার, আয়াত ৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৮)।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে আদম (আঃ) থেকে শুরু কোরে আল্লাহর শেষ রসুল পর্যন্ত যত নবী-রসুল পৃথিবীতে এসেছেন এবং শেষ রসুল সাফায় উঠে সমবেত মানুষকে যে ডাক দিলেন **সেটা 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন আদেশদাতা নেই', 'লা মা'বুদ এল্লা আল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই' নয়।** আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত কোন নবী অন্য কোন কলেমা নিয়ে আসেন নাই। আল্লাহর শেষ কেতাব কোরানে **একটিবারের জন্যও লা মা'বুদ এল্লা আল্লাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এটা অতি সত্য কিন্তু সেটা কলেমা নয়, এ দীনের ভিত্তি নয়,** এ কলেমা পাঠ কোরে অন্য দীনের কোন মানুষ এই দীনে প্রবেশ কোরতে পারবে না। এ দীনে প্রবেশ কোরতে হোলে তাকে যে কালেমটা অবশ্যই মুখে উচ্চারণ কোরতে হবে, অন্তরে বিশ্বাস কোরতে হবে এবং কাজে পরিণত কোরতে হবে সেটা হোচ্ছে 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ', আল্লাহ ছাড়া আর কোন আদেশদাতা নেই। হুকুমদাতা, আদেশদাতা আদেশ কোরলে তবে তো এবাদত, আদেশ কোরেছেন বোলেই তো এবাদত করা হয়, আদেশ না কোরলে তো এবাদত কোরতে হোত না, সুতরাং **আদেশ আগে, আদেশ পালন অর্থাৎ এবাদত পরে** (বল, 'আমি আদিষ্ট হোয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত, অকপট হোয়ে তাঁর এবাদত কোরতে।' (কোরান- সুরা যুমার, আয়াত ১১); এলাহ আগে, মা'বুদ পরে। এলাহ এবং মা'বুদ দু'টি আল্লাদা শব্দ, ভিন্ন অর্থ।

দীনুল হকের, এসলামের কলেমার অনুবাদের এবং সেই ভুল অনুবাদকে বিশ্বাস করার ফল কি হোয়েছে? ফল এই হোয়েছে যে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি আল্লাহর এবাদত করার জন্য পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ সুদৃশ্য, জাক- জমকপূর্ণ মসজিদ তৈরী কোরে সালাহ (নামায) পড়ছে, যাকাহ দিচ্ছে, হজ্ব কোরছে, রোযা রাখছে, এবং এছাড়াও বহু রকম নফল এবাদতও কোরছে, ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর নির্দিষ্ট কিছু আদেশও পালন কোরছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ যে আদেশ নিষেধ কোরেছেন তা মানছেনা, পালনও কোরছে না, প্রত্যাখ্যান কোরছে অর্থাৎ **আল্লাহকে এলাহ বোলে মানছে না, মা'বুদ বোলে মানছে।** জাতীয় জীবনের ব্যাপারে এ জনসংখ্যা জুডিও- খৃষ্টান যান্ত্রিক জড়বাদী সভ্যতার আনুগত্য কোরছে অর্থাৎ দাজ্জালের অনুগত হোয়ে গেছে, দাজ্জাল ও তাই চায়। এ কাজ কোরে তারা এ দীনের ভিত্তি, কলেমা থেকেও বের হোয়ে গেছে। আল্লাহর শেষ নবী এসে আল্লাহর যে সার্বভৌমত্বকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে গিয়েছিলেন সেই সার্বভৌমত্ব মানুষ আবার বিসর্জন দিয়ে মানুষের, দাজ্জালের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ কোরেছে, দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়েছে।

তার উম্মাহ যে এই কাজটি কোরবে তা আল্লাহর রসুল জানতেন, আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন- তাই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গেছেন- তোমরা তোমাদের পূর্ববর্ত্তীদের অনুসরণ অনুকরণ কোরবে, এমন কি তারা যদি সরীসৃপের গর্ত্তে প্রবেশ করে তবে তোমরা তাও কোরবে। নবীকে প্রশ্ন করা হোল- হে আল্লাহর রসুল! (যাদের অনুসরণ করা হবে) **তারা কি ইহুদী ও খৃষ্টান? তিনি জবাব দিলেন- আর কারা (**হাদীস- আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে- বোখারী, মোসলেম ও মেশকাত) ? তাহোলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ও মাহ্দীর (আঃ) মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানের এই জনসংখ্যা সম্বন্ধে কেন বোলেছেন যে তারা তাঁর কেউ নয়, তিনিও তাদের কেউ নন। আনাস (রাঃ) থেকে তিরমিযি ও জাফর (রাঃ) এ থেকে রাযিনের এই সহিহ হাদীস থেকে আমরা নিশ্চিত সুসংবাদ পাচ্ছি যে তিনি থেকে মাহ্দী (আঃ) পর্যন্ত মোসলেম নামধারী জনসংখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে

(De Facto) মোশরেক ও কাফেরে পর্য্যবসিত হোলেও তাঁর উম্মাহ ধ্বংস হবে না; **আবার এনশাল্লাহ এই বিভ্রান্ত জনসংখ্যার মানুষ থেকে এমন মানুষ জন্মাবে** যারা এমনভাবে রসুলাল্লাহর নিজের হাতের গড়া উম্মাহর মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মত হবে যে তাঁর নিজের পক্ষেই বলা মুশকিল হবে যে তারাই ভালো নাকি ঐ শেষের এরা ভালো। শোকর আলহামদোলেল্লাহ।

চতুর্থ কারণ- একদিন বিশিষ্ট সাহাবা আবু ওবায়দা (রাঃ) আল্লাহর রসুলকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা যারা আপনার সঙ্গে থেকে কঠিন জেহাদ কোরলাম, আমাদের চেয়ে ভালো লোক কি আর হবে? আল্লাহর রসুল জবাব দিলেন- আখেরী যমানায় এমন লোক আবির্ভূত হবে যাদের অবস্থান (দরজা) তোমাদের চেয়েও বহুগুণ ঊর্দ্ধে হবে। বিস্মিত আবু ওবায়দা (রাঃ) জিজ্ঞাসা কোরলেন- কি জন্য তাদের দরজা এত উন্নত হবে? জবাবে আল্লাহর রসুল বোললেন- আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তাদের সঙ্গে থাকবো না (হাদীস- আবু ওবায়দা (রাঃ) থেকে- আহমদ মেশকাত)। একটু খেয়াল কোরলে এই হাদীসটির মধ্যে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ প্রশ্ন কোরছেন কে? তিনি আর কেউ নন- আবু ওবায়দা (রাঃ) যিনি এমন মানুষ ছিলেন যাকে আল্লাহর নবী তাঁর নিজের উপাধি আল- আমিন দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আবু ওবায়দাকে (রাঃ) উপাধি দিয়েছিলেন- আমিন উল মিল্লাত, মিল্লাতের আমিন, যিনি ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহর রসুল আহত হবার পর তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণের পেরেক ঢুকে যাওয়ায় সে পেরেক কামড়িয়ে বের করার চেষ্টায় নিজের একাধিক দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। যিনি আল্লাহর রসুলের পরে উম্মতে মোহাম্মদীর জেহাদের আমির (Commander) হোয়ে উত্তর ইরাকের অধিকাংশ এলাকা দখলে এনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আবু ওবায়দা (রাঃ) কী বোলছেন- তিনি বোলেছেন, আমরা যারা আপনার সঙ্গে থেকে কঠিন জেহাদ, সংগ্রাম কোরলাম। এ প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবারা এ দীনের কোন্ কাজটাকে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে কোরতেন। আবু ওবায়দা (রাঃ) এ কথা বোললেন না যে, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা যারা আপনার সাথে থেকে সালাহ (নামায) কায়েম কোরলাম, আপনার সাথে সওম রাখলাম, হজ্ব কোরলাম, যাকাহ দিলাম, অন্যান্য অনেক ওয়াজেব, নফল এবাদতও কোরলাম। তিনি এসবের একটাও উল্লেখ কোরলেন না যেগুলি নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত আছি, তিনি জেহাদের কথা বোললেন- যেটা আমরা শুধু ত্যাগ কোরি নাই, একেবারে অপ্রয়োজনীয় মনে কোরে ভুলেই গেছি। শুধু তাই নয়, উম্মতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত এ জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এর বিরোধী। আবু ওবায়দার (রাঃ) এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে **আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবারা ঈমানের (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ) পরেই কোন্ কাজ, আমলটাকে স্থান দিতেন।**

আবু ওবায়দার (রাঃ) মত সাহাবার প্রশ্নের উত্তরে রসুলাল্লাহ যে জবাব দিলেন তার পরিষ্কার অর্থ এই যে ভবিষ্যতে এই উম্মাহ আবার জাগবে, আবার তার আকীদা সঠিক কোরে তার সঠিক অবস্থানে ফিরে যাবে। এখানে একটা কথা পরিষ্কার কোরে বুঝে নিতে হবে। সেটা হোচ্ছে এই যে আখেরী যমানার যে উম্মতে মোহাম্মদীর কথা রসুলাল্লাহ বোঝাচ্ছেন **তাদের ঠিক সেই সাহাবাদের মতই হোতে হবে।** শুধু তফাৎ থাকবে এই যে, নবীর সাহাবাদের সঙ্গে নবী ছিলেন, তার শেষ যমানার মো'মেনদের সঙ্গে তিনি থাকবেন না। অর্থাৎ আকীদায়, ঈমানে, আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য পার্থিব সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ উৎসর্গের জন্য উদগ্রীব, ইস্পাতের মত ঐক্যে, শৃংখলায়, আনুগত্যে ও হেজরতে **ঠিক সাহাবাদের মত, তফাৎ শুধু একটি এবং**

তা হোল আল্লাহর রসুলের মত নেতৃত্ব ও প্রেরণা, আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব এই শেষ যমানার উম্মতে মোহাম্মদীর সঙ্গে থাকবেনা। শুধু এই তফাতের জন্যই তাদের স্থান হবে তাদেরও ঊর্দ্ধে। আল্লাহর রসুলের এইসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি থেকে (আরও আছে) আমরা নিঃসন্দেহ হোতে পারি যে ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের এই বিকৃত, শুধু বিকৃত নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দীনটি আবার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে সত্যদীন দীনুল হক, দীনুল এসলাম পাঠিয়েছিলেন সেই দীনে ফিরে যাবে; বর্ত্তমানের এই ফিস্ক (অবাধ্যতা), শেরক (অংশিদারিত্ব), কুফর (অবিশ্বাস), যুলম (অন্যায়), মোনাফেকী (কাপট্য) ও মালাউনী (অভিশপ্ত) ত্যাগ কোরে প্রকৃত মো'মেন ও মোসলেম এবং রসুলের অসম্পূর্ণ কাজকে, যে কাজের ভার, দায়িত্ব তাঁর উম্মাহর ওপর দিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন, সেই কাজ পুনরায় শুরু কোরে আবার উম্মতে মোহাম্মদী হবে। এনশাল্লাহ সে সময় নিকটবর্ত্তী।

প্রকৃত এবাদত

কলেমার প্রকৃত অর্থ- 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ (আদেশদাতা, সার্বভৌম) নেই'কে বদলিয়ে 'কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই'তে পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ কলেমাটারই পরিবর্ত্তনের ফল কি হোয়েছে তা পেছনে বোলে এসেছি। মানুষ জাতীয় জীবনে আল্লাহর সমস্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান কোরে ইহুদী- খৃষ্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জাল কে এলাহ এবং রব (প্রভু) বোলে মেনে নিয়েছে। এদিকে ব্যক্তি জীবনে সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ্ব, সওম (রোযা) ও নানাবিধ কাজ কোরে আত্মতুষ্টিতে ডুবে আছে এই মনে কোরে যে তারা খুব এবাদত কোরছে। দেখা যাক আল্লাহ কোন্ এবাদত চান, প্রকৃত এবাদত কী?

এবাদতের প্রকৃত অর্থ হোচ্ছে- **যে জিনিসটিকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে সেই কাজটি করাই হোচ্ছে সেই সৃষ্ট জিনিসটির এবাদত।** সূর্য্যকে সৃষ্টি করা হোয়েছে আলো এবং তাপ দেবার জন্য, ঐ কাজই তার এবাদত এবং সুর্য্য নিরবচ্ছিন্নভাবে তা কোরে চোলেছে- এবাদত কোরছে। আল্লাহ এই পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি কোরেছেন অর্থাৎ প্রধানত গাছপালা, ফসল, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপাদন করা, তা সে ত্রুটিহীনভাবে কোরে চোলেছে, মাটি তার জন্য নির্দিষ্ট এবাদত কোরে চোলেছে। এমনিভাবেই পানি, আলো, বিদ্যুৎ, আগুন ইত্যাদি প্রত্যেক সৃষ্টিই সেটাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে তা নিখুঁতভাবে পালন কোরে চোলেছে এবং যার যার জন্য নির্দিষ্ট এবাদত কোরে চোলেছে। এ গেলো আল্লাহর সৃষ্ট জিনিসগুলি। মানুষের সৃষ্ট জিনিসের ব্যাপারেও ঐ একই নিয়ম; মানুষ যে জিনিস সৃষ্টি কোরেছে সেই কাজটি করাই সে জিনিসের এবাদত। মানুষ মোটর গাড়ি (Car) সৃষ্টি কোরেছে, উদ্দেশ্য- ঐ সৃষ্ট জিনিসটি মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। ঐ কাজটি করাই মোটর গাড়ির (Car) এবাদত। মানুষ বিদ্যুত উৎপাদন কোরছে আলো দেবার জন্য, রেডিও টেলিভিশন এবং অন্যান্য যন্ত্র চালাবার জন্য। বিদ্যুত তার কাজ কোরছে, এটাই তার এবাদত এবং বিদ্যুত রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি যে সমস্ত যন্ত্র চালাচ্ছে- সেই সব যন্ত্রের যার যা কাজ তাই করাই ঐ সব যন্ত্রের এবাদত এবং তারা তা নিখুঁতভাবে কোরে যাচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে একটিই তফাৎ তা হোল মানুষ যা সৃষ্টি করে তার জন্য কাঁচামাল (Raw material) দরকার। আল্লাহর তা প্রয়োজন নেই; তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশই যথেষ্ট। **এখন দেখতে হবে আল্লাহ মানুষকে কি জন্য, কি কাজের জন্য সৃষ্টি কোরলেন।** সেটা জানতে ও বুঝতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের প্রকৃত এবাদত কী?

মানুষ সৃষ্টির বহু আগেই তিনি এই মহাবিশ্ব ও মালায়েকদের (ফেরেশতা) সৃষ্টি কোরেছেন। একদিন তিনি মালায়েকদের বোললেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা স্থাপন কোরতে চাই (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত- ৩০)। এবং মালায়েকদের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর খলিফা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি কোরলেন (আমরা মানুষ ঐ আদমের (আঃ) সন্তান বনি- আদম (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুরা নেসা, আয়াত ১))। অর্থাৎ আদম (আঃ) ও **ঐ সঙ্গে আমরা মানুষ হোলাম আল্লাহর খলিফা।** তাহোলে খলিফা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা আমাদের সঠিকভাবে বুঝে নেয়া অতি প্রয়োজনীয়। তা না হোলে আমরা আমাদের প্রকৃত এবাদত কি তা বুঝতে পারবো না। খলিফা শব্দের আভিধানিক অর্থ হোচ্ছে-

প্রতিনিধি; সার্বভৌম সরকারের শাসনিক প্রতিনিধির পদ বা কার্য্য; দূত; উপরওয়ালার বদলে কার্য্যরত ব্যক্তি; কোন রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ শাসক, রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদি (বিভিন্ন অভিধান)। **অর্থাৎ কেউ কোন কাজ নিজে না কোরে অন্য কাউকে সেই কাজ করার জন্য নিযুক্ত কোরলে সেই লোক হোল তার খলিফা।** অনেক বেশী সংখ্যায় মুরিদ হওয়ায়, বা অন্য যে কোন কারণে কোন পীর, শায়খ মুরিদদের মধ্য থেকে বেছে বেছে তার খলিফা নিযুক্ত করেন। উদ্দেশ্য হোচ্ছে এই যে ঐ খলিফারা শায়খ যে পদ্ধতিতে অর্থাৎ তরিকায় তার মুরিদদের শিক্ষা দেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে মুরিদদের শিক্ষা দেবেন তা থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম কোরতে পারবেন না। অর্থাৎ পীরের পক্ষ হোয়ে, তার হোয়ে কাজ করা অর্থাৎ পীরেরই কাজ অন্য একজন কোরছেন, কারণ তাকে পীরের খলিফা নিযুক্ত করা হোয়েছে। যদি মুরিদ শায়খের খেলাফত পেয়ে শায়খের পদ্ধতি, তরিকা কেটে- ছেটে বা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে নিজে তরিকা তৈরী কোরে সেই মোতাবেক মুরিদদের তালিম তরবিয়ত দিতে থাকেন, কিন্তু মুখে শায়খের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন তবে শায়খ বা পীর কি তাকে তার খলিফা হিসাবে সহ্য কোরবেন?

অন্য একটি উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একজন সার্বভৌম বাদশাহ বা রাজা তার বিশাল রাজত্বের একটি প্রদেশের জন্য একজন শাসক (Gover nor) নিযুক্ত কোরলেন। ঐ শাসক হোলেন বাদশাহর নিযুক্ত রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ বাদশাহর খলিফা। বাদশাহর তৈরী আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি ইত্যাদি যা দিয়ে বাদশাহ নিজে শাসন কাজ পরিচালনা করেন, তার নিযুক্ত ঐ রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ খলিফারও কাজ হবে তাই; অর্থাৎ বাদশাহর যা কাজ ঐ খলিফারও সেই কাজ। ঐ প্রতিনিধির কোন অধিকার নেই বাদশাহের দেওয়া কোন আইন, কোন দণ্ডবিধি, অর্থনীতিতে কোন পরিবর্ত্তন করার। ঐ প্রতিনিধি যদি মুখে বাদশাহর সার্বভৌমত্বকে সদাসর্বদা স্বীকার কোরেও বাদশাহর দেওয়া আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদির কোনটা বাদ দিয়ে তার নিজের হুকুম চালান তবে বাদশাহ কি তাকে তার পদে রাখবেন? তাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি বহাল রাখবেন? নাকি তাকে রাজধানীতে ডেকে নিয়ে তাকে শুধু পদচ্যুতই কোরবেন না, তাকে কঠোর শাস্তিও দেবেন। ঐ প্রতিনিধি, গভর্নর, খলিফা যদি প্রকাশ্যে বাদশাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা কোরে দিনে পাঁচবার বাদশাহকে সাজদাও করে কিন্তু বাদশাহর দেওয়া শাসনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজের তৈরী শাসনব্যবস্থা, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তৈরী কোরে সেগুলি দিয়ে বাদশাহর প্রদেশ শাসন করে তবে বাদশাহ তার মৌখিক ঘোষণা ও পাঁচবার সাজদাকে কোনই দাম দেবেন না, তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তাহোলে বোঝা যাচ্ছে যে **খেলাফত হোচ্ছে কেউ তার নিজের কর্ত্তব্য কাজগুলি যদি নিজে না কোরে সেগুলি করার জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করে তবে তাকে খেলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হোল** এবং সেই নিযুক্ত লোকটি হোল খলিফা। আল্লাহ আদম (আঃ) অর্থাৎ বনি- আদম, মানুষজাতিকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত কোরলেন, এবং কোরলেন তাঁর মহাসৃষ্টির, মহাবিশ্বের মধ্য থেকে শুধু এই পৃথিবীতে। বোললেন- 'ফিল আরদে' অর্থাৎ পৃথিবীতে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও নয় (কোরান- সুরা বাকারাহ, আয়াত ৩০)। তাহোলে খলিফা হিসাবে পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ কি? কর্ত্তব্য কি?

বনি- আদমকে, মানুষকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত না কোরলে আল্লাহর যে কাজ ছিলো সেইটাই হোল মানুষের কাজ, কর্ত্তব্য। কী সেই কাজ? আল্লাহর কি কাজ? **আল্লাহর কাজ হোল শাসন। নিজের সৃষ্ট এই মহাবিশ্বকে শাসনই তাঁর কাজ। পৃথিবীতে এই কাজটা তিনি নিজে না কোরে দায়িত্ব দিলেন মানুষকে;** অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর হোয়ে, তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি

হোয়ে পৃথিবীতে শাসন কোরবে। কেমন কোরে কোরবে? আল্লাহ যেমন নিজের তৈরী আইন-কানুন, নিয়মনীতি মোতাবেক মহাবিশ্ব শাসন কোরছেন, তেমনি পৃথিবীর শাসনের জন্য তিনি নিজে শাসন কোরলে যে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি দিয়ে শাসন কোরতেন সেই আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি তাঁর খলিফাকে দিয়ে বোললেন- এইগুলি অনুযায়ী তোমরা তোমাদের শাসনকার্য্য পরিচালনা কোরবে। এটাই হোল তোমাদের এবাদত যে জন্য তোমাদের আমি সৃষ্টি কোরেছি।

এই মহাবিশ্ব (Universe) সৃষ্টি কোরে তাঁর স্রষ্টা আল্লাহ সেটাকে তাঁর নিজের সৃষ্ট আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরিচালনা কোরছেন। এই মহাসৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই, কোন জিনিস নেই যার বিন্দুমাত্র, এমনকি অণুমাত্র স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। যাকে যে কাজ বেঁধে দিয়েছেন সে কাজ সে নিখুঁতভাবে কোরে চোলেছে; তা থেকে পরমাণু পরিমাণও বিচ্যুতির শক্তি নেই। এই প্রথম তিনি একটি জীব সৃষ্টি কোরলেন যার মধ্যে তিনি তাঁর আইন-কানুন, নিয়ম-নীতিকে ভঙ্গ কোরবার ইচ্ছাশক্তি দিলেন। কেমন কোরে দিলেন? আদমকে (আঃ) সৃষ্টি কোরে তিনি তাঁর মধ্যে নিজের রূহ, আত্মা থেকে ফুঁকে দিলেন (কোরান- সুরা হেজর, আয়াত ২৯; সুরা সাজদা, আয়াত ৯; সুরা সা'দ, আয়াত ৭২)। নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে দেওয়ার অর্থ আল্লাহর যত গুণ (সিফত) আছে সবগুলিই আদমের মধ্যে চোলে এলো। আল্লাহর গুণগুলির (সিফত) মধ্যে একটি হোল কাদেরিয়াহ, নিজের ইচ্ছামত কাজ করার শক্তি, যেটা সৃষ্টির আর কারো নেই; যে জন্য মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত। আল্লাহর গুণগুলি (সিফত) প্রত্যেকটিই অসীম, যেমন তিনি নিজে অসীম; কিন্তু আদমের (আঃ) অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যেটুকু তিনি ফুঁকে দিলেন সেটুকু হোল অতি সামান্য। মহাসমুদ্র থেকে একটি ফোটার মত, এমনকি তাও নয়। আল্লাহ আদমকে (আঃ) তাঁর নিজের গুণাবলি ও শক্তি দিলেন কেন? কারণ হোল- কেউ কাউকে তার নিজের কাজ করার জন্য খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত কোরলে তাকে তার পক্ষ হোয়ে কাজ করার ক্ষমতা অবশ্যই দিতে হবে নইলে সে কি কোরে কাজ কোরবে? পার্থিব কাজেও কেউ নিজের কাজের দায়িত্ব অন্যকে অর্পণ কোরলে তাকে ওকালতনামা বা Power of Attorney দিতে হয়। নিজের আত্মা থেকে আদমের (আঃ) মধ্যে ফুঁকে দেওয়াকেই তিনি বোললেন- আমি আদমকে আমার আমানত দিলাম (কোরান- সুরা আহযাব, আয়াত ৭২)।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ একমাত্র আদেশদাতা, এলাহ এবং একমাত্র উপাস্য, মা'বুদ। **প্রথমে তাঁকে একমাত্র এলাহ, আদেশদাতা সার্বভৌম বোলে স্বীকৃতি দিতে হবে, তারপর তাঁর আদেশ মেনে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালন কোরতে হবে** অর্থাৎ তিনি নিজে যে কাজ কোরতেন অর্থাৎ শাসন তা তারই দেয়া আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক কোরতে হবে, এটাই হোল তাঁর এবাদত। কলেমার এলাহ শব্দকে মা'বুদে, উপাস্যে পরিণত করার ফল এই হোয়েছে যে আজ মোসলেম বোলে পরিচিত কিন্তু কার্য্যতঃ কাফের, মোশরেক, যালেম, ফাসেক ও মোনাফেক এই জনসংখ্যা এলাহতেও নেই, মা'বুদেও নেই, কারণ এটা আল্লাহর উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ্ ত্যাগ কোরে দাজ্জালের উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ গ্রহণ কোরেছে এবং আল্লাহর এবাদত ত্যাগ কোরে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়েছে, তার এবাদত কোরছে। এই জনসংখ্যা এবাদত মনে কোরে কি কাজ কোরছে তা দেখা যাক।

আল্লাহ মানুষকে অর্থাৎ আদম (আঃ) ও বনি-আদমকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত কোরেছেন, অর্থাৎ তাঁর হোয়ে তাঁরই দেয়া আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি অনুযায়ী নিজেদের শাসন কাজ পরিচালনা

কোরতে আদেশ কোরেছেন। আল্লাহ বোলেছেন, যারা আমার নাযেল করা বিধান (কোরান) দিয়ে শাসনকার্য্য পরিচালনা (হুকুম) করে না, তারা কাফের, জালেম এবং ফাসেক (কোরান- সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই বিভ্রান্ত(দোয়াল্লিন) জনসংখ্যা সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ্ব ও সওম (রোযা) পালন কোরে মনে কোরছে আমরা খুব এবাদত কোরছি। **আল্লাহর প্রতিনিধি হোয়ে পৃথিবীতে তাঁর কাজ যদি খেলাফত অর্থাৎ এবাদত হোয়ে থাকে** তবে প্রশ্ন এই যে- আল্লাহ কি সালাহ (নামায) কায়েম করেন? তিনি কি যাকাহ দেন? তিনি কি হজ্ব করেন? তিনি কি সওম (রোযা) রাখেন বা রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন বা অন্যান্য যে সব কাজ কোরে এরা মনে করেন যে খুব এবাদত কোরছি, তার একটাও করেন? অবশ্যই নয়। এগুলো খেলাফতের অর্থাৎ প্রকৃত এবাদতের কাজ নয়। তাহোলে এগুলো কি? এগুলো হোচ্ছে- আল্লাহর দেয়া দীনে (জীবন- ব্যবস্থায়) মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার অঙ্গনের, ভাগের (Facet) সমাধান ও ব্যবস্থা দেওয়া আছে; তা না হোলে তা সর্বাঙ্গীন ও নিখুঁত হয় না। আল্লাহর দেয়া দীন (জীবন- ব্যবস্থা) পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। তিনি বোলেছেন- তোমাদের জন্য দীন আমি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ কোরে দিয়েছি (কোরান- সুরা মায়েদা, আয়াত ৩)। শুধু তাই নয় তিনি বোলেছেন- এতে আমি কিছুই বাদ দেই নি (কোরান- সুরা ফোরকান, আয়াত ৩৩)। কাজেই মানুষের জীবনের বিভিন্ন ভাগের (Facet) জন্য তাঁর বিধান দেয়া আছে। তাঁর দীনকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল রাখার জন্য ও কখনও এটার ওপর কোন আক্রমণ আসলে তাকে প্রতিহত করার জন্য যে ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্যপূর্ণ ও অন্যায়বিরোধী চরিত্রের মানুষের প্রয়োজন সেই চরিত্রের মানুষ সৃষ্টির জন্য সালাতের (নামাযের) ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষের জীবনে অর্থ ও সম্পদ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়; সেটার সুব্যবস্থা, যাতে সেখানে অর্থ ও সম্পদের অসম বণ্টন না হয়, অবিচার না হয় সেজন্য সমস্ত সম্পদের দ্রুত সঞ্চরণভিত্তিক যাকাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে দীনের কোথায় কি অবস্থা, কি সমস্যা, কোথায় কি করা প্রয়োজন এবং হাশরের দিনে আল্লাহর কাছে জীবনের কাজের হিসাব দেবার মহড়ার (Rehearsal) জন্য বাৎসরিক হজ্বের ব্যবস্থা রেখেছেন। তারপর যেহেতু মানুষ দেহ ও আত্মার সম্মিলিত একটি একক (Unit) তাই তার আত্মার পরিচ্ছন্নতা উন্নতির জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন সাওমের (রোযার)। লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে যে **দীনের পাঁচটি রোকনের (স্তম্ভের) চারটিই সমষ্টিগত, মাত্র একটি হোচ্ছে ব্যক্তিগত এবং সেটি সওম (রোযা)।**

এবাদত মনে কোরে আজ এই গোমরাহ (বিভ্রান্ত) জনসংখ্যা যা কোরছে তা প্রকৃত এবাদত অর্থাৎ খেলাফতের কাজ নয়; খেলাফতের কাজ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া দীনকে (জীবন- ব্যবস্থা) প্রয়োগ ও কার্য্যকরী (Effective) ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন সেগুলি। **প্রকৃত এবাদত হোচ্ছে আল্লাহর দেয়া দীন (জীবন- ব্যবস্থা) মোতাবেক তাঁর পক্ষ হোয়ে শাসন করা।** সেই এবাদত থেকে এই জনসংখ্যা আজ শুধু লক্ষ কোটি মাইল দুরে নয়, একেবারে বিপরীতমুখী। দাজ্জালের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে এটা **আল্লাহর ফাসেক (অবাধ্য) হোয়েছে** এবং দাজ্জালের, মানুষের তৈরী জীবন- ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ কোরে আল্লাহর উপাসকের বদলে **দাজ্জালের উপাসকে পরিণত হোয়েছে।** আজ মোসলেম নামধারী নামাযী, যাকাহ দানকারী, হজ্ব ও রোযা পালনকারী এই জনসংখ্যা 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' কলেমার এলাহতেও নেই, সেটার ভুল অর্থ কোরে যে মা'বুদে গেছে সে এবাদতেও নেই। আল্লাহ এই জনসংখ্যার এলাহও নন, মা'বুদও নন (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়ুন)।

আমি জানিনা যে আল্লাহ যে এবাদত করার জন্য মানুষ সৃষ্টি কোরলেন সেই প্রকৃত এবাদত আমি বুঝিয়ে বোলতে পারলাম কিনা। যে এবাদতের কথা তিনি বোলেছেন, "আমি জ্বীন ও মানুষ জাতিকে আমার এবাদত করা ব্যাতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নি (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' বইটি পড়ুন)।" এই এবাদত হোচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার কোরে নিয়ে তাঁর খেলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব করা। এটা কোরতে গেলেই **তাঁর পূর্বশর্ত্ত তাঁর দীনুল হক অর্থাৎ তাঁর দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।** এটা আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। অর্থাৎ কোথাও তাঁর প্রকৃত এবাদত অর্থাৎ খেলাফত নেই, এমন কি আমরা হেযবুত তওহীদ, যারা দীনুল হকে আছি, আমরাও প্রকৃত এবাদত কোরতে সমর্থ নই।

এক অনন্য সুযোগ

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- **অভিশপ্ত দাজ্জাল কে যারা প্রতিরোধ কোরবে তাদের মরতবা (সম্মান, দরজা ও পুরস্কার) বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শহীদের মরতবার সমান হবে।** [হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

দাজ্জালের গোটা ব্যাপারটাই মহা গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট। মানবজাতির আয়ুষ্কালের মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা এ কথায় কোন সন্দেহ নেই, কারণ এটা বোলেছেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল। কিন্তু উপরের এই হাদীসটি আমাদের, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের মানুষের জন্য একটি বিশেষ বার্ত্তা, সংবাদ এনে দিচ্ছে। হাদীসটি একটু খেয়াল কোরে পড়লে এর কয়েকটি বিশেষত্ব চোখে পোড়বে। এসলামে আল্লাহ তাঁর মো'মেন বান্দাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার রেখেছেন শহীদদের জন্য এবং তা হোচ্ছে পার্থিব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, বিনা বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতে স্থান দেওয়া। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানও রেখেছেন সেই শহীদদের জন্যই এবং তা হোচ্ছে তারা মরলেও তাদের মৃত না বলা। শুধু তাই নয়- আল্লাহ শহীদদের জন্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (Speci al t i es) দান কোরেছেন যা অন্য মো'মেন, মোসলেম তো বটেই এমন কি তাঁর নবী-রসুলদেরও দেন নাই; যেমন শহীদের গোসল দেয়া, জানাজা পড়া, কাফন দেয়া ইত্যাদির দরকার নেই, তারা কবরে মালায়েকদের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন না ইত্যাদি। এই সম্মান, এই পুরস্কার ও এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব শহীদদের জন্য।

দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারীদের সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে,

(১) তারা শহীদ না হোয়েও শুধু প্রতিরোধ ও যুদ্ধ কোরেই শাহাদাতের সম্মান, পুরস্কার ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন।

(২) দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারী অর্থাৎ যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরবে আল্লাহ তাদের দুইজন শহীদের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান কোরবেন। এছাড়া এসলামের আর কোথাও কাউকে দুইজন শহীদের পুরস্কার বা সম্মান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নাই। শুধুমাত্র উম্মে হারাম (রাঃ) বর্ণিত একটি মাত্র হাদীসে পাওয়া যায় যে সামুদ্রিক যুদ্ধে ডুবে মারা গেলে সে মোজাহেদকে দু'জন শহীদের সমান সওয়াব দেয়া হবে। এ হাদীসটির উৎস সুনানে আবু দাউদ এবং এটি সহিহ হাদীস নয়, হাসান; তাও ঐ দুই শাহাদাত সাধারণ শাহাদাত।

(৩) দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারীদের আল্লাহ শুধু যে দুইজন সাধারণ শহীদের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান কোরবেন তা নয়, ঐ দুই শহীদ আবার একটি বদরের যুদ্ধের শহীদের এবং আরেকটি ওহোদের যুদ্ধের শহীদের।

(৪) সমস্ত শহীদদের মধ্যে বদর ও ওহোদ যুদ্ধের শহীদদের মরতবা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ বদর ও ওহোদের যে কোন যুদ্ধে আল্লাহর রসুল (দঃ) পরাজিত হোলে তওহীদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোত না। আল্লাহর রসুল বদরের যোদ্ধাদের সম্বোধন কোরে বোলেছেন- **তোমরা যা ইচ্ছা কোরতে পারো, তোমাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত হোয়ে গেছে** (হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী)। লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে বিশ্বনবী এই আশ্বাস দিচ্ছেন বদরের যোদ্ধাদের,

শহীদদের নয়, যারা শুধু যুদ্ধ কোরেছেন, শহীদ হন নাই তাদের। আর দাজ্জালের প্রতিরোধকারীদের সুসংবাদ দেয়া হোচ্ছে শুধু ঐ বদরের যোদ্ধাদের নয়, শহীদের; এবং শুধু বদরের নয়, বদরের এবং ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সম্মিলিত পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্যের।

দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারীদের জন্য আল্লাহ এমন অকল্পনীয় সম্মান, পুরস্কার ও আসন (মাকাম) কেন রেখেছেন? তার কারণ এখানে প্রশ্ন এবলিসের দেয়া আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ, আল্লাহর জয় পরাজয়ের প্রশ্ন। আজ দাজ্জাল আল্লাহর তওহীদকে প্রত্যাখ্যান কোরে নিজেকে রব বোলে দাবী কোরে, আল্লাহর হাত থেকে তাঁর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে মানবজাতির ওপর মানুষের সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। মানবজাতির অতি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন একটি অংশ ছাড়া আজ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলার মত পৃথিবীতে আর কেউই নেই। **দাজ্জাল তার সর্বশক্তি নিয়োগ কোরে সেই ক্ষুদ্র দলটিকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পোড়ে লেগেছে।** কাজেই দাজ্জালের বিরোধিতা করা, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জেহাদ করার পুরস্কার বদর ও ওহোদের শহীদদের পুরস্কারের, সম্মানের সমান।

৫) পরকালে শহীদরা সমস্ত মো'মেন ও মোসলেমদের ঈর্ষার পাত্র হবেন এবং দেখা যাচ্ছে দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারীরা সমস্ত শহীদদের ঈর্ষার পাত্র হবেন। এমন কি বদরের এবং ওহোদের শহীদদেরও। কারণ তারা প্রত্যেকে একজন শহীদের সম্মান, পুরস্কার ও বৈশিষ্ট্য পাবেন। বদরের শহীদ বদরের যুদ্ধের শাহাদাতের এবং ওহোদের শহীদ ওহোদের যুদ্ধের শাহাদাতের পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য পাবেন। বদরের শহীদ ওহোদের এবং ওহোদের শহীদ বদরের শাহাদাতের পুরস্কার ও সম্মান পাবেন না। কিন্তু দাজ্জালের প্রতিরোধকারীদের আল্লাহ বদরের এবং ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সম্মিলিত পুরস্কার, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান কোরবেন।

সমস্ত এসলামে আমি কোথাও কোন কাজের, কোন সৎকার্য্যের জন্য এতবড়, এত অকল্পনীয় বিরাট পুরস্কার ও সম্মান দেখি না। এ পুরস্কার ও সম্মান সমস্ত শহীদদের জন্য পুরস্কার ও সম্মানকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। **এই অকল্পনীয় সম্মান ও পুরস্কারের সুযোগ কোন নবী রসুল পান নি, কোনও উম্মাহও পান নি** কারণ তাদের সময় দাজ্জাল আবির্ভূত হয় নি। দাজ্জাল আবির্ভূত হোয়েছে আমাদের সময় এবং ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নেমে এসে তাকে হত্যা অর্থাৎ ধ্বংস করার পর আর কোনদিন দাজ্জাল আবির্ভূত হবে না। যেহেতু ৪৭৪ বছর আগে দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে এবং বর্ত্তমানে সে পূর্ণবয়স্ক সেহেতু সন্দেহের বিশেষ কোন অবকাশ নেই যে ঈসার (আঃ) আগমনের সময়ও নিকটবর্ত্তী। তিনি দাজ্জাল ধ্বংস কোরলেই **আর কোনদিন দাজ্জালের প্রতিরোধ কোরে ঐ অকল্পনীয় সম্মান ও পুরস্কারের সুযোগ থাকবে না।**

মানুষের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ বছরের মধ্যে এই যে সামান্য সময়টুকু আমরা পাচ্ছি, এই সময়ের মধ্যে যারা দাজ্জাল কে প্রতিরোধ কোরবেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) কোরবেন শুধু তারাই ঐ অকল্পনীয় পুরস্কার ও সম্মান পাবেন আল্লাহর কাছ থেকে।

পেছনে বোলে এসেছি যে দাজ্জাল কে প্রতিরোধকারীদের জন্য আল্লাহ যে সম্মান ও পুরস্কার নির্দ্ধারণ কোরে রেখেছেন তা সমস্ত এসলামে আর কারও জন্য রাখেন নি; এমন কি অন্যান্য শহীদদের এবং নবী-রসুলদের জন্যও নয়। কোন শহীদদের বা নবী-রসুলদের দুই দুইটি শাহাদাতের সম্মান ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি; তাও বদরের ও ওহোদের যুদ্ধের শহীদদের সমান এবং শহীদ না হোয়েও ঐ সম্মান ও পুরস্কার। এর কারণ কি?

এর কারণ হোচ্ছে এই যে **দাজ্জাল আল্লাহকে তাঁর সার্বভৌমত্বেও (উলুহিয়াতের) আসন থেকে চ্যুত কোরে নিজে সে আসনে বোসতে চায়।** দাজ্জালের দাবী এই যে মানবজাতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান কোরে তার দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা তাদের সামষ্টিক জীবনে, অর্থাৎ মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সে কেমন কোরে চোলবে সে ব্যাপারে দাজ্জালের কোন দাবী নেই; মানুষ মসজিদে, মন্দিরে, চার্চে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যাক না যাক, আল্লাহকে, ঈশ্বর ও দেব-দেবীকে, গডকে, এলিকে বা বুদ্ধকে উপাসনা করুক আর নাই করুক তার কোন দাবী নেই। কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে অর্থাৎ রাজনীতিতে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে, আইন-কানুন, দণ্ডবিধিতে, শিক্ষানীতিতে স্রষ্টার দেওয়া বিধান ও মূল্যায়নকে পরিত্যাগ কোরে **দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতার বিধান ও মূল্যায়নকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা করাই হোচ্ছে তার দাবী।**

দাজ্জালের এই দাবী সমস্ত মানবজাতি মেনে নিয়েছে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ নং হাদীস), এমন কি মোসলেম হবার দাবীদার জাতিটিও মেনে নিয়েছে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ১২ নং হাদীস)। আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও স্রষ্টার, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই, মানবজাতির সমষ্টিগত জীবনে আজ মানুষেরই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে, আর এটাই হোচ্ছে দাজ্জালের দাবী। রাজতন্ত্র (Monarchy), সমাজতন্ত্র (Socialism), গণতন্ত্র (Democracy), সাম্যবাদ (Communism), একনায়কতন্ত্র (Fascism) এগুলো সবই দাজ্জালের বিভিন্ন রূপ। এর মধ্যে বর্ত্তমানে গণতন্ত্র অন্য সব রূপকে ছাপিয়ে, অবদমিত কোরে আধিপত্যের স্থান দখল কোরেছে এবং এটাকেই জুডিও খৃষ্টান সভ্যতা নিজেও গ্রহণ কোরেছে এবং এটাকে বাকি মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দেবার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই কোরছে। গত বিশ্বযুদ্ধে যদি হিটলারের একনায়কতন্ত্র (Fascism) জয়ী হতো, তবে বাকি পৃথিবী আজ ফ্যাসিজম, একনায়কতন্ত্রের অধীনে থাকতো; এবং গণতন্ত্র ও সাম্যবাদকে অপাংক্তেয় কোরে রাখতো, যেমন আজ একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদকে কোরে রাখা হোয়েছে। হিটলারের জার্মানীর অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের পরাজয়ের পর দাজ্জালের অন্য বিভাগ, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ পৃথিবীর আধিপত্যের জন্য বহুদিন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধের (Cold War) পর সাম্যবাদ (Communism) পরাজিত হোয়ে গেলো এবং ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে গেলো। এই দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধ সার্বিকভাবে যুদ্ধে (Shooting War) পর্য্যবসিত হয় নাই শুধু একটিমাত্র কারণে, আর সেটা হোল- এই উভয় পক্ষের হাতেই ছিল পারমাণবিক অস্ত্র; উভয় পক্ষই জানতো যে এক পক্ষ এটা ব্যবহার কোরে অপরকে ধ্বংস কোরতে পারলেও তার নিজেরও ধ্বংস অনিবার্য্য। যাহোক **একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদের এই পরাজয়ের পর থেকে ধনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক শক্তিই আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সার্বভৌমত্বেও অধিকারী এবং এই শক্তিই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে পরাজিত কোরে নিজে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছে।**

গণতন্ত্রই মানুষের জীবন-ব্যবস্থার (দীন) সর্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্র, প্রণালী, এবং এর কোন বিকল্প নেই- এ কথা পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, বক্তৃতায়, আলোচনায় এবং শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবিশ্রান্ত, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারের ফলে **আজ প্রায় সমস্ত মানবজাতি এই মিথ্যাকে, এই কুফরকে সত্য বোলে গ্রহণ কোরেছে।**

এই মিথ্যাকে গ্রহণ কোরতে কোন জাতি রাজী না হোলে বা গড়িমসি কোরলে দাজ্জাল তাদের সঙ্গে অন্য জাতিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কোরে (Economic Sanction) আর্থিকভাবে

তাদের ক্ষতি কোরে তাদের বাধ্য করে। তাতে যদি কাজ না হয় তবে তাদের অবরুদ্ধ করে অর্থাৎ অবরোধ আরোপ (Embar go) কোরে তাদের নতজানু হোতে বাধ্য করে (দাজ্জালের পরিচিতি অধ্যায়ের ৮ নং হাদীস)। তাতেও যদি ঐ জাতি আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ না করে অর্থাৎ গণতন্ত্র মেনে না নেয় তবে তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা কোরে তাদের পরাজিত কোরে মানুষের সার্বভৌমত্ব গ্রহণ কোরতে বাধ্য করে। এই কোরতে যেয়ে তারা হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বেসামরিক লোক, নারী, শিশু, বৃদ্ধদের বোমা মেরে হত্যা করে, শত শত নগর, গ্রাম গুড়িয়ে দেয় এবং এ কাজকে তারা কোন অন্যায় মনে করে না। এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে তারা বলে Col l at er al damage, আনুষাঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি, এটা কিছু না, যুদ্ধে এটা হোয়েই থাকে।

এই পৃথিবী যার হাতের মুঠোয়, যাকে পরাজিত করার শক্তি কারো নেই সেই মহাশক্তির বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বিজয়ী করার জন্য তাদের প্রাণ ও পার্থিব সম্পদ নিশ্চিতভাবে কোরবানী করার জন্য দাঁড়াবে তাদের জন্য আল্লাহ যে এসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান তাঁর কাছে মজুত রাখবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কী? এ সম্মান ও পুরস্কার নবী-রসুলদের জন্যও আল্লাহ রাখেন নি কারণ কোন নবী-রসুলকে **এমন মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয় নি যেটার শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে** (পরিচিতি অধ্যায়ের ১৩ নং হাদীস)।

কিন্তু এই দানবরূপী দাজ্জাল ও আল্লাহর নবী ঈসার (আঃ) হাতে ধ্বংস হবে এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে- এ সুসংবাদ আল্লাহর শেষ রসুল আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন (হাদীস- আব্দুলাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে- মোসলেম এবং নাওয়াস বিন সা'মান (রাঃ) থেকে- মোসলেম ও তিরমিযি এবং মেকদাদ (রাঃ) থেকে আহমেদ, মেশকাত)। এই যুগে জন্মে মানুষ জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনায় অংশ নিয়ে দাজ্জালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছ থেকে এই অকল্পনীয় পুরস্কার ও সম্মান যারা লাভ কোরবে না তারা প্রকৃতই হতভাগ্য।

এই বইটিকে যেন আল্লাহ তাঁর অপার করুণায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে এক দুর্বল প্রতিরোধ হিসাবে কবুল করেন এই কামনা করি। আমীন॥